আঁধারে রঙিন রাখাল

নাসরীন জাহান

নিয়াজ জামান
ফেরদৌস আজিম

যাঁদের অনুবাদ মাধ্যমে আমার বেশ কিছু লেখা পৃথিবী দেখেছে। এই উদারতার সীমা পরিসীমা নেই।

আশ্চর্য রঙবাজ লোক।

শুনে এসেছে আশৈশব থেকে, আজীব চেহারা তার, কিছু নেই গুণ। কী করেই বা থাকতে পারে? কখনো মাথা ঊর্ধ্বপানে তুলে, কখনো দিঘির পায়ে জবুথবু হয়ে কী সব জানি বিড়বিড় করে বলে। ছেলেবেলাতেই চোখে অন্ধকার নেমে এসেছে।

কিছুদিন মা দেখেছে।

এরপর বাপ মরেছে।

মা চলে গেছে আরেক ব্যাটার হাত ধরে। তারপর আর কী?

বালু খাও। বাতাস খাও।

কিন্তু, না। মা'র প্রস্থানকে সে সহজভাবে নিতে পারে নি। বোঝার পর থেকে যে-কোনো বিষয়ে দারুণ নির্লিপ্ত ছেলেটি, অন্ধকার চোখেও মা'র চলায়মান দৃশ্যকে স্পষ্ট দেখতে পেত। হাতে টিনের বাক্স। দরদর বাতাসে তার ডুরে শাড়ির আঁচল উড়ছে। যাওয়ার আগে কাঁচা নতুন শাড়ির গন্ধে বুকে চেপে ধরেছিল ছেলেটির মুখ ... অস্পষ্ট গোঙানি কষ্টে বলেছিল, আমার ওপরে যে ছাদ, চাল নাই, চাইর পাশে বেড়া নাই, আব্রু ঢাকনের কাপড় নাই... শকুন কাউয়ারা খালি গোশ্‌ত খাইতে চায়। তরে আল্লার ময়দানে ছাইড়া গেলাম।

তখনো ব্যাপারটির ভয়াবহতা সম্পর্কে ছেলেটি বুঝতে পারে নি।

শুধু অন্ধ চোখে মা'র চলে যাওয়ার ধ্বনির মধ্যে দেখেছিল ডুরে শাড়ির রক্তাক্ত রঙ। ধেয়ে ধেয়ে এক অদ্ভুত বিক্ষত যন্ত্রণার মধ্যে সেই রঙ ছুরি হয়ে এসে যখন তার হৃৎপিণ্ড কাঁপাতে থাকে, পোড়ানো যন্ত্রণায় দুহাত শূন্যতায় হাতড়ে গুমড়ে গুমড়ে কাঁদে সে। সে দু'হাত চোখে নিয়ে যায়।

নিশ্চল আঁধার চোখপুঁতির পাঁজর ভেঙে গালের দিকে ধাবিত হতে থাকা জল সে স্পর্শ করে অন্ধকারের সামনে মেলে ধরে, নোনাজলের রঙ দেখে, শাদা— না, একেবারে শাদা কি?

ফাঁপরে পড়ে যায়, জলের রঙের নাম কী?

কেউ একজন মমতাময়ী পড়শি এসে মাথায় হাত রেখে ওর সামনে দু'মুঠো খাবার দিয়ে বলে, খা। দুনিয়া বড় নিষ্ঠুর রে। খা। সব সইজ্জ্য করণ যায়, খিদা না।

এই দানার লাইগাই তোর মায় বুকে পাথর চাইপ্যা এক গোরস্থান থাইকা আরেক গোরস্থানে গেছে।

থিতানো কান্না গিলে ছেলেটি নিজে সেই মহাতাজ্জবে পড়ে যায়, দানার লাইগ্যি ? তয় যে মায় কইল, কাউয়া শকুন ?

অই অইল... পড়শির কণ্ঠের মায়ার ঝাঁপট ওর নিশ্বাস রুদ্ধ করতে থাকে।

পড়শি নিজ অভিজ্ঞতায় জারিত দর্শন ঝাড়তে থাকে, ঘাড় টানলে যেমুন মাথা আহে, মাথা টানলে শইল... যেমুন কানের মইধ্যে চিমটি দিলে মাথা থাইক্যা শুরু কইরা দেহের বেবাক বিভাগে কষ্ট জাগে, বেবাক বিভাগ চিক্কুর দেয়, মনে কর এই রকমই কাউয়া শকুন যৈবতী নারীর গোশত খাওনের লগেও থাহে খাদ্য খিদার সম্পর্ক... এহেন চক্কর খাওয়া কথায় ছেলেটির যখন বোদাই মুখে নিথর... পড়শি গন্ধ আঁচল দিয়ে তার চোখ মুছিয়ে দিতে দিতে এই আকালের দিনে যেখানে কর্মজীবনের পীড়নে কারও ভালোমন্দ একবাক্য শোনার সময় নেই, এমন সময় তার কথা শুনতে চাওয়ার এমন নিঃশব্দ শ্রোতা পাওয়া তুমুল আগ্রহে আরও কয়েক ধাপ এগোয়—

বুঝলি না তো ?

ছেলেটি ক্রমশ নিষ্কম্প, স্থির।

নে, খা, চাবান দে... আমি বুঝাইতাছি ...ধর একটা ইটের উপরে আরেকটা ইট... এই রকম কইরা কইরা তাক তাক কইরা রাখন হইল, গরিবের জীবনে খিদা, শইল্যের গোশত, ট্যাকা পইসার অভাব... আরো বেবাক কিছু.. হাত, পাও, মাথার মতো, এইসব কিছুই শইল্যের একটা আরেকটার লগে লাইগ্যা থাহে, একটা ইটে টান দিলে যেমুন বেবাক ইটে ধাক্কন লাগে, শইল্যের এক জায়গায় চিমটি দিলে যেমুন বেবাক শইল্যে জানান লাগে, তেমুনই, তর যুবতী মার যুদি আইজকে লক্ষ কুটি টাকা থাকত, তাইলে হেয় না চাইলে কাউয়া শকুন আগাওয়াতে সাহস পাইত না। ঘরে এক দানা চাউল নাই, যৌবন ঢাকনের কাপড় নাই... এই দশায় একলা নারীর যহন এই মরদের দুনিয়ায় হাত পাততে হয়... খা, বাপ, খা। আমি আর কয় বেলা ? এই কঠিন দুনিয়ায় তুইওতো অন্ধ অবলা...। হের পরেও তর বাঁচনের যুদ্ধ তরেই করতে যে অইব... মমতাময়ী পড়শি এইসব বুঝিয়ে, সান্ত্বনা দিয়ে আরেকটি কঠিন দীর্ঘশ্বাসে রাখালকে রীতিমতো ব্যাপক শূন্য পৃথিবীর দিকে ছিটকে দেয়।

উড়তে উড়তে চক্কর খেতে খেতে এই দুনিয়ার কঠিন দারিদ্র্য, অবহেলা, লাঞ্ছিতার মহা হুজ্জোতে পড়ে এক সময় নিজের জানতে অথবা অজান্তে টের পায়, সে একজন ভিক্ষুকে পরিণত হয়েছে।

দারিদ্র্যকে ঘৃণা করে সে।

ভিক্ষাবৃত্তিকেও।

কিন্তু ছেলেবেলা থেকে কম ঠোক্কর তো খায় নি সে। এই অন্ধ চোখ নিয়ে কী করে সে নিজের এই অবস্থার সাথে লড়াই করে ?

শৈশবের দুঃসহ অবস্থায় চলতে চলতে শুরু হলো ক্রমাগত আপোস। যে আপোষে সে মা বাবা'র দেয়া নাম পর্যন্ত ভুলে শৈশব-কৈশোরের সমস্ত মুখের ছায়া পর্যন্ত অপছায়া করে আশ্চর্যভাবে এগিয়ে আসতে দেখত এক উদাস দুখু বাউলের মুখকে। যে দিনের পর নিজে বাঁশি বাজিয়ে ক্রমাগত শুনত ছেলেটির বাঁশির সুর। আর বলত— মাইনষে কী সব নামে ডাকে তরে— ট্যাপা, সইফ্যা, কুদ্দুইসলা— এইসব কুন নাম হইল! তর অন্তরের বেদনায় অনেক বড় শিল্প আছে রে। জীবনে তো কম বাঁশি বাজাই নাই। কম শুনি নাই। এর বাঁশির মধ্যে কী আজব কান্দনের সুর রে আমার শইল... রক্ত গাছ পাতা বেবাকই সেই সুরে কাঁপে। তুই জন্ম রাখাল রে, রাখাল।

রাত যায় দিন যায়।

নাগরিক আকাশ ছিঁড়ে পাখি যায়। এবং খুব আশ্চর্য মা'র বিদায়মান ডুরে শাড়ির রঙ অন্ধ চোখে স্পষ্ট দেখেও বিস্ময় বেদনার চক্রবাজিতে ব্যাপারটি রাখাল ঠাহর করে উঠতে পারে নি। কিন্তু কৈশোর থেকে জীবনের নানা পরতের যুদ্ধে ক্রমশ সে আবিষ্কার করেছে, বিভিন্ন রঙের প্রতি তার দুর্মর কৌতূহলের অনুভবের তীব্রতা কত প্রখর। কত... কত দিন নানা ভাবনায় এসব নিয়ে কত যে ভেবেছে রাখাল।

যেমন গাছের পাতা সবুজ না হয়ে নীল হলে কেমন হতো ? কিংবা আকাশ যদি পাক্কা বেগুনি অথবা টসটসে সবুজ হতো ?

যখন পথে পথে হেঁটেছে আর বিড়বিড় করে আত্মকথনে লিপ্ত হয়ে ভিক্ষা নিয়েছে, একদিন পাশে শুয়ে থাকা বিড়ালটিকে স্পর্শ করে প্রায় সজোরেই বলে, বিড়াল এত কালো হয় ?

আর যায় কোথায় ?

বেদম প্রহার।

ইয়ার্কি ? অন্ধ মানুষের অভিনয় করে ভিক্ষা ? মানুষ যখন কাউকে মারপিট করার সুযোগ পায়, রাস্তা দিয়ে হেঁটে যেতে থাকা সাদাসিদা লোকটির ভেতরেও কেমন ঘাপটি মেরে থাকে অবদমন ক্ষুধার্ত হিংস্র পশু... তখন তা প্রত্যক্ষ করা যায়। এই পৃথিবীতে কোটি টাকা, মিলিয়ন ডলার ইউরো গিলছে যে মস্ত চোরেরা, তাদের প্রতি যে-কোনো মানুষই শ্রদ্ধায় বিনত, কিন্তু রাস্তার একজন উপোসী মানুষ যদি প্রাকৃতিক স্বভাবে বাঁচার তাগিদে স্রেফ ভাত চুরি করে, পথে যেতে থাকা সেই সাদাসিদে মানুষ থেকে শুরু করে রাজ্যির লোক তাকে পিটিয়ে মেরে ফেলে পর্যন্ত ভীষণ রিরংস স্বস্তিতে ভোগে।

ভাগ্যিস এই প্রহারে রাখাল বেঁচে গিয়েছিল। তবে টানা হাসপাতালে থাকতে হয়েছিল ক'দিন।

তুমুল ধকল গেছে শরীরের ওপর দিয়ে। একে তো নিকষ আঁধার চারপাশে। অন্যদিকে হাসপাতালে নানা রঙের বিষাক্ত গন্ধ, আর যন্ত্রণাকাতর মানুষের চিৎকার গোঙানির শব্দ।

কে যে এই মায়া-মমতাহীন আকালের দিনে তাকে হাসপাতালে ভর্তি করে দিয়ে গেছে, আল্লা জানে।

তবে বিস্ময়কর, একজন নার্সের মিষ্টি কণ্ঠ আর হাত মায়ার স্পর্শ তার ওপর আছড়ে পড়ে— কেমন বোধ করছেন এখন ?

সরকারি হাসপাতালের বেশির ভাগ সরকারি ডাক্তার-নার্সের নানারকম বিরক্তিময় কর্কশ কণ্ঠ যখন চারপাশ অস্থির, মুখর করে রাখে, তখন যেন এই নারীর আগমন আসমান ধেয়ে নেমে আসা পরীর মতো। সে এলেই তার খুটখুট হিলের ধ্বনি কান পেতে শোনে রাখাল, কতদিন যন্ত্রণাকাতর দেহ নিয়ে শুধু অপেক্ষা করেছে, কখন সেই পরী ডিউটিতে আসবে। যখনই সে এসেছে, রাখাল তাড়িয়ে তাড়িয়ে তার স্নেহ-মমতা গিলেছে। আজ যখন সেই নার্স কুশল জিজ্ঞেস করে অস্ফুট কণ্ঠে বলে, আপনার পোশাকের রঙ কী শাদা গো, শরৎবেলার আসমান মেঘের মতো।

মুহূর্তে কম্পিত নার্সের হাত, আপনি আমাকে দেখতে পারতেছেন ? কেমনে ?

তার হাতের স্পর্শেই অজানা রোমাঞ্চে কাঁপে রাখালের হাত, বিশ্বাস করেন, আমি জানি না, কেমনে পারি। কেমনে অন্ধ লালন এই দুনিয়ার মানুষের আত্মা-ঘর রঙ দেইখ্যা মানুষের বেবাক দেহমন খুঁইড়া জাইন্যা কী কইরা গাইতো গান, কইবার পারেন ? আমি খালি ছুঁইয়া, ঘেরান দিয়া আন্ধা চক্ষে রঙই দেহি, তাই আমারে অবিশ্বাস কইরা এমন মরণ মারণ মারল বেবাকে ? আপনিও কি আমারে অবিশ্বাস করেন ?

আপনি কে ? লালন রে জানেন ? সত্যিই রাস্তার ভিখিরি, নাকি ছদ্মবেশী অন্য কেউ ?

নার্সের এই বিস্ময়জনিত কণ্ঠে হাত ছাড়িয়ে তীব্র অভিমানে মুখ ঘুরিয়ে শুয়ে থাকে রাখাল। এত মরণ যন্ত্রণায়ও যে এদ্দিন এককোঁটা গোঙায় নি, কাতরায় নি, তার চোখ বেয়ে পড়তে থাকা ঢলায়মান জলের দিকে তাকিয়ে বিচলিত বোধ করে নার্স, প্লিজ থামুন। আপনি লালনের কথা কইলেন, আমার প্রাণটা কেমুন কাঁইপা উঠল। দিনভর রোগীর সেবা, রাতভর লালনের গান— আমার জীবনে আর কোনো কিছু নাই কি না, সেই আপনি লালন এর গান সম্পর্কে যেভাবে কইলেন–তাজ্জব লাগল কী না, সেই জন্যেই— নার্স অজানা দীর্ঘশ্বাস লুকায়, আপনি দোহাই কষ্ট পাইয়েন না।

এইবার মুখ ঘোরায় রাখাল। নার্স যখন হাতের পাল্‌স দেখছে, সে আকুল কণ্ঠে প্রশ্ন করে, ক্যান আপনি এই বিরান কঠিন দুইন্যাত, আমারে মায়া করেন? যখন আমি ভুইল্যা গেছি মায়া কী, যতন কী ? খালি মানুষের ঘিন্না, খালি মানুষের দূর দূর ?

নার্স রাখালের কপাল স্পর্শ করে বলে, কী জানি, দুনিয়া কী দেখে, আমি নিজেও বলতে পারব না, আপনার এই অন্ধ চোক্ষের পুঁতিতে গভীর কালো, কী যেন মায়ার জাদু আছে। যে পলকের অস্থিরতায় কখন দিশেহারা হয় না, অন্য অন্ধদের মতো। হ্যাঁ, আমারও মনে হয়, মনের সব ভাষা আইসা জমা হয় এই চক্ষুতে। সেই চোখও লালনের মতো সব দেখে। কারো করুণা সাহায্য চায় না। আর কয়দিন যাবতই অবাক হয়া দেখি, আপনি যখন আমার দিকে তাকান। মনে হয় স্থির চোখে আমাকে দেখতেছেন। কখনো তো আমি নিজেও বিব্রত হইছি। পাবলিকের আর কী দোষ ?

রাখালের দেহভূমণ্ডল ভূমিতে ব্যাপক বিলোড়ন ওঠে, সে কাঁপতে কাঁপতে ঠোঁটের ভাঁজ খুললে ত্বরিত নার্সের তাড়া ওঠে, সে অন্য পেসেন্টের দিকে যেতে উদ্যত হলে রাখাল প্রবল আকুতিময় কণ্ঠে জিজ্ঞেস করে, আপনের নাম কী কইবেন ?

জোসনা... ।

এইবার হাসপাতাল ছাড়িয়ে রাখালের দু'পা দু'ডানায় ভর করে বিশাল পূর্ণিমার নহরে ভাসতে থাকে। তার চোখ সুন্দর ? এ-ও কেউ একজন অন্ধের চোখ দেখে বলতে পারে ?

এরপর সেই রাখাল এক ভোঁ-এ তুমুল শৈশবে যায়, অতল অভিমান যন্ত্রণায় হাতড়ে হাতড়ে মা-কে খুঁজতে থাকে। তখন মা-ও যেন পরী, গুনগুন গান গেয়ে উঠতি শিশুকে বুকের পরম ওমে গেঁথে হেঁটে হেঁটে দেখাচ্ছে পাতার রঙ, সূর্যের রঙ।

মেঘের, পূর্ণিমার রঙ... ।

পূর্ণিমা... জোসনা।

যুবকের আকুল পৌরুষ তরঙ্গিত হয়, সর্ব অস্তিত্বের তুমুল অগ্নির এমন এক অচেনা মহোৎসবের জন্ম হতে থাকে, তা ভীষণ অচেনা। এক অদ্ভুত দিশেহারার

মাঝে বিন্যস্ত আর থিতু হতে থাকে এক তাজ্জব অনুভূতি... জোসনা। তবে কি সেই নারী চন্দ্র থেকে জোসনার আলো নিয়ে নেমে আসা সত্যিই এক পরী ? যে মোমের শিখায় সেই আলো জ্বালিয়ে তার চোখে স্থাপন করে জীবন্ত করে তোলে রাখালের চক্ষু ?

এইভাবে যখন হাসপাতালের বেডে দিনগুলি রাতগুলি যাচ্ছে, তখন একদিন ভীষণ বিষণ্ন জোসনা এসে দেখে, রাখালের মুখে খেলে যাচ্ছে অপার্থিব হাসি। বিড়বিড় করছে রাখাল, আহারে, পুরা অঙ্গ যেন শাদা রঙে হাসতাছে। বাহ্! বাহারের শাদারে; শাদার ভিতর শাদা যেন উথালপাথাল ঢেউের খেলা খেইলা চলতাছে। কী কষ্ট গো জোসনাদি আপনের ? কোনো কষ্ট কি শাদার ভিতরে এত কষ্ট লেপটায়া দিবার পারে ?

সুখ য্যান গিইল্যা খায় গো শাদা কাপড় মনের মানুষটার কষ্টরে। এই প্রার্থনা করি গো জোসনাদি আমার পরাণের অতল থাইক্যা।

তুমি কী কইরা জানে আমি কষ্টে আছি ?

হেঃ হেঃ মাথা নাড়ে রাখাল, কষ্ট ছাড়া আমার কষ্ট অত মায়ায় ছুঁইতে পারে কার সাধ্যি ? কষ্ট ছাড়া এই জনমের এই অভাগা অন্ধ চোক্ষেরে কেমনে সে সুন্দর দেখে ?

তোমার চোখের মায়া দেখছি। অখন শুনি তোমার কথার মায়ার জাদু। হাসপাতাল থাইক্যা তোমার যে যাওনের সময় হইল রাখাল।

ভেতরের অনন্ত বেদনা গিলে রাখাল বলে, তা তো আমি বেবাগ গোছানোর শব্দেই বুঝবার পারছি।

একটু থেমে বলে, একটা কথা জিজ্ঞেস করি ? আপনে যখন পয়লা পয়লা 'তুমি' কইরা কুশল জিগাইতেন— একজন রাস্তার ভিক্ষুক, যার 'তুইতুকারী'তে অভ্যাস তখন কি জানতাম এই রাখালের মধ্যে একজন লালন বাস করে ? যে লালনের কথা সুরের পূজা করি আমি। জানালা দিয়ে দমকা বাতাস আসে। ভেতরের সেভলন মেশানো গুমোট গন্ধের কক্ষটি সেই বাতাসে মুহূর্তে দুলে ওঠে। ফিসফিস কণ্ঠ ধ্বনিত হয় জোসনার কণ্ঠে, তোমার নাম রাখাল কেন ? তুমি বাঁশি বাজাইতে পারো ?

তক্ষণি ফের শৈশবে মা'র কোলে ঝাঁপ দেয়। বাবার মৃত্যুর পর রাত রাত মা দূর অরণ্যের গাছতলায় বাজানো কারো বাঁশির শব্দ শুনে উজানো কান্নায় ওকে ডেকেছিল, রাখাল বলে, এরপর একটি বাঁশি ওকে মা কিনে দিয়ে বলেছিল, এই রকম বাজাইবি আর আমারে শুনাইবি জনম জনম। আমি এই সুরে হারা জীবনের বেবাক দুঃখু ভুইলা যাইমু। মা'র প্রস্থানের পর সে প্রচণ্ড যন্ত্রণা, ক্রোধ কষ্টে দূর অরণ্যে বাঁশি ছুঁড়ে যখন জীবন দিশেহারায় ডুবজল খাচ্ছে তখন জীবনে এলো, দুখু বাউল।

সেই ছোট্ট কিশোরকে গেরামের দুখু বাঙাল শিখিয়েছিলও ক'দিন। সে-ও মরল।

জোসনার পাশে স্তব্ধ হয়ে বসে থাকে রাখাল। এ আরেক বিচ্ছেদ। আরেক মায়ার বন্ধন ছিন্ন করে ফের ধুলা-মাটির সাথে লেপটে লেপটে ধড়ফড়ানি উড়াল যাতনার খেলা!

হায় জীবন!

এরপর আবারও জীবনের সাথে ধাক্কা খেতে খেতে লটকে সটকে— আরো অনেকদূর।

সব সমাজেই কিছু মতলববাজ লোক থাকে। যারা আপন মতলব হাসিল করতে অন্যকে ভালো বুদ্ধিও দেয়। রাখাল ভিখিরি সারাদিন অন্ধকার সাঁতরে সাঁতরে শহরতলীর এক বিশাল বৃক্ষের নিচে এসে ঘুমায়। অদ্ভুত অভ্যাস তার। একা একা কথা বলা। সে শুয়ে শুয়ে বলে...

মায়ের রঙে কালো আছিল

চাঁদের রঙে হলুদ আছিল

ভাতের রঙে সুবাস আছিল।

তক্ষুনি যেন ওপর অনন্তের সিঁড়ি ধরে প্রদীপ হাতে এগিয়ে আসে এক নারী। বদলে যায় রাখালের কথা। আকুল রোমান্সময় অনুভব অথবা বিচ্ছেদের যাতনা থেকে সে ক্রমশ অপসৃয়মাণ, রাখাল সেই নারীর দিকে তাকিয়ে বলে,

মায়ের রঙ কালো আছিল।

শইস্যের রঙ সবুজ আছিল।

জোসনার রঙ শাদা আছিল।

তার পাশে বসে এক মতলববাজ লোক টিয়ে পাখি নিয়ে ভাগ্য রচনা করত।

সারাদিন টিয়ের সে-কী ক্যাচ ম্যাচ। তার চেয়ে চতুর্গুণ প্রগলভ মতলববাজ। সে এই টিয়ে পাখির ঠোঁট দিয়ে কাগজ উঠিয়ে বামুনকে চাঁদে পাঠায়, ফকিরকে প্রাসাদ বানিয়ে দেয়, বেকার যুবককে বিদেশ পাঠায়, কুঁজোকে চিৎ করে শোয়ায়— কত কী ...।

সারাদিন পর টিয়েরা যখন ক্ষান্ত, মতলববাজের চোখে নেমে আসে ভুতুড়ে ঘুম। তখন রাত্রি জাগরিত রাখাল ভিখিরির ঘুম শুনতে কার ভালো লাগে ?

সে মহাবিরক্ত হয়ে ঠেলা দেয় একদিন,

ওই ব্যাটা ভাগ!

কী ক্ষতি করছি ভাই ?

আরে তুই আমার ভাই হইলি কবে ? চুপ কর। ঘুমাইবার দে।

কী ক্ষতি করছি ভাই ?

আরে! এ তো পোষা ময়না ! চুপ কর।

এরপর ঘুমিয়ে পড়ে মতলববাজ। রাখাল তো জলমৎস্য, চেয়ে থাকলেও যা, ঘুমোলেও তা।

সে শুয়ে শুয়ে দেখে বাতাসের রঙ, তারাদের রঙ, রাত্রির অন্ধকারে সব বৃক্ষ ঘুমিয়ে পড়লে যা ধারণা করে, তার রঙ... এক সময় আবার তার সমস্ত রোমকূপ শিহরিত... এক অদ্ভুত রোমাঞ্চে সে আকুল হয়ে যৌবনে ওঠা প্রথম নারীহাতের স্পর্শ তার পৌরুষকে উদ্বুদ্ধ করলে সে হাতড়ে হাতড়ে সেই নারীর যৌবন স্পর্শ করে, এরপর সে অনুভব করে এক অপার্থিব জ্বর জ্বর বোধের মধ্যে তার জননেন্দ্রিয়র উত্থান...। সেই নারী গান নয় তারই মতো রাত্রি জেগে পূর্ণিমায় চুল মেলে গান নয় যেন গীত গাইছে... পড়শি যদি আমায় ছুঁতো...।

আঠালো জলে লুঙ্গি ভিজে গেলে সে নিজেকে নিয়ে মহা ফাঁপড়ে পড়ে যায়। নিজেকে তখন সে এ নিয়ে ছিঃ ছিঃ ধিক্কার দিতে থাকে,

আরে একী ? একই শয্যায় তারই পাশে মতলবের বুকের ওপর উঠে এক নারীর ছেনালি হাসির শব্দ ? দু'জনের মোচড়া মুচড়িতে ক'বার যে রাখাল নিচে পড়ে গিয়ে আবার দাঁড়ায় গুনে পায় না। শেষে ওদের সুযোগ দিয়ে সে বটগাছের নিচে ঘাসের ওপর শুয়ে পড়ে। সে চোখ বুজে শুঁকে জোসনার যৌবনের রঙ... না... পায় না, কেবল চোখ মেলে দেখে সে নারী মুখ পেতে আছে তার মুখের ওপর, আহা! কী নিদারুণ সুন্দর তার অন্ধ চোখ জন্মের প্রথম স্বীকৃতি... সে তার চোখ পুঁতির রঙ খুঁজতে খুঁজতে স্খলিত এ আঠালো জলে আলুথালু হয়ে নেতিয়ে আসা দেহের নিঃসাড় ক্লান্তির মাঝে ঘুমিয়ে পড়ে।

মতলববাজের নামই মতলব মিয়া। জীবনে তার প্রচুর অভিজ্ঞতা। প্রথমে সিঁদ কেটে চুরি করত। একদিন পিঠে ধাপুসধুপুস বাড়ি খেয়ে এমন মেরুদণ্ড ভাঙল। অনেক দিন ফ্রি হাসপাতালে পড়েছিল। এরপর শহরে এসে গ্রামের অভিজ্ঞতা কাজে লাগাতে চেষ্টা করেছে। কত সুনিপুণ দক্ষতায় মানুষের পকেট কাটা যায়, এক ওস্তাদের কাছে এই অভিজ্ঞতা নিয়ে নেমে পড়ে এ পথে। এ ক্ষেত্রেও প্রথম দিকে সাফল্য আসতে শুরু করে। সবচেয়ে সে সুবিধা বোধ করত, জানাজায় গিয়ে পকেট কাটতে।

সামনে লাশ রেখে খুব আশ্চর্যজনকভাবে মানুষ জীবন-মৃত্যুর ওপারে চলে যায়।

গ্রাম থেকে আসার আগে সে কিছুদিন করেছিল এক চেয়ারম্যানের চামচাগিরি।

একদিন প্রতিপক্ষের গুলিতে চেয়ারম্যান চিরদিনের জন্য দুনিয়া ছাড়লে কিছুদিন ঝিম ধরেছিল। কিন্তু বসে থাকা তার ধাতে নেই। স্ত্রী-সন্তানের প্রতি বীতশ্রদ্ধ রাত শুকিয়ে সেই যে শহরে এলো, আর ওদের কোনো খোঁজ নেয় নি।

ধেই ধেই করে বৃষ্টির তেজ বাড়ছে, রাত্রিভর। সাথে খিটখিটে আসন্ন বৃষ্টির ঝাঁপটানি, খিটখিটে বোধ এইজন্য মতলবের, নগরে আসার পর কোনো ঋতুরই উল্টাপাল্টা বাড়াবাড়ি সহ্য হয় না তার। সেই কবে এসেছে সে গ্রাম ছেড়ে, নগরের যাবতীয় কুচুটিপনার সাথে পরিচিত হয়েছে, নিজেও নিজেকে সেঁধিয়ে দিয়ে অভ্যস্ত হতে পেরেছে কোনো কোনোটার সাথে।

কিন্তু খড়ের গাদায় প্রায় উদোম দেহটাকে পেতে দিয়ে, আসি আসি শীতের মৌজগন্ধে যে পাগল বুঁদ থাকত, ছাউনির নিচে এই ঋতুতেও যে যাই যাই বৃষ্টির কনকনে দমকটাকে কাঁথার নিচের আন্ধার উত্তাপে শুয়ে মমতার সাথে উপভোগ করত— তার প্রধান শত্রু হয়েছিল রাজধানীতে আসার পর আসন্ন শীতকাল। সে একমাত্র তাল মেলাতে পারে না এই শহুরে প্রকৃতির সাথেই।

ততদিনে তিন বাচ্চাসহ ফিবছর সন্তান বিয়ানো স্ত্রীকে গ্রামে রেখে এসেছে সে অনেক আগেই। ধান্ধাবাজ বন্ধুর পাল্লায় মিশে গাঁজা-ফেনসিডিলের ব্যবসা করেছে। কচকচে টাকার ঘ্রাণে নাক ডুবিয়ে চক্ষে যখন ঘুম ঘুম... বড় ছেলে যেন মহাদিঘির ওপার থেকে ডাক দিয়েছে— আব্বা... আ... আ...। স্নায়ুর বিভ্রমে চমকিত হয়ে হা হা হাসিতে ফেটে পড়ে মতলব একসময় ঘুমিয়ে পড়েছে।

একেবারে হাভাতে ঘরে জন্ম নেয়া মতলব বেড়ে উঠতে থাকা বয়স থেকেই কী জানি কোন অজানা কারণে নিজেকে অন্যরকম বোধ করেছে। তার বয়সি সবাই যখন ভাত-মাছ আর সুজলাসুফলা, শস্যশ্যামলা স্ত্রীর খোয়াবে বিভোর, তখন তলপেটের উদোম খিদায় পাগলপ্রায় মতলব শুকনো মুড়ি দিয়ে নিজেকে থামিয়ে দীঘির ওপারে উদাস বসে থেকে দূরের পথে চেয়ে থেকেছে। তার রক্ত কণিকায় ধারাবাহিক ক্ষরণ— না, এই জীবন না, কেবল স্ত্রী-সন্তান আর গেরামে পড়ে পড়ে মরণ না। যত এইসব শূন্যতার ঘেরাটোপের ফাঁসে সে আটকা পড়েছে, ততই ঋতুর পর ঋতু তার চামড়া, ইন্দ্রিয় আত্মার মধ্য দিয়ে বয়ে গেছে আউলা বাউলা নদীর মতো।

একবার যখন ঘোর বন্যা গ্রামে, স্ত্রীর গলায় পেঁচিয়ে থাকা সাপটাকে দস্যুহাতে দূরে ছুড়ে ফেলে মাঝ রাতে জীবনের জন্য সে গ্রাম ছেড়েছে... যতই সে দূরবর্তী... ততই চরম বিস্ময়ের মধ্যে আবিষ্কার, সন্তান, স্ত্রী-কারো জন্য তার মায়া নেই; বরং নিজেকে শ্যাওলা ঝরানো স্বাধীন, মুক্ত মানুষ মনে হচ্ছে।

এর পর এই শহরের সবচেয়ে জনবহুল ঝক্কিপূর্ণ যানজটময় এলাকার সুতীব্র কোলাহলের মধ্যে নিজেকে সেঁধিয়ে ক্রমে ক্রমে অনুভব করেছে, এইসব শব্দের গরমে তার অস্তিত্ব থেকে গ্রামের নির্জনতার যা কিছু অবশিষ্ট ছিল, পিচঢালা পথের খেপামোর মুখে গলে গলে পড়ছে। বিড়ালের মতো চক্ষু-কান খাড়া করে রাখলে ওস্তাদ মিলতে কী আর অসুবিধা ? গেরামের এক দোস্তের সুবাদে ওস্তাদের নজরে— এর পর ফেনসিডিল... গাঁজা... কালো ধোঁয়া... লাল ধোঁয়া... ইঁদুরচালাকি শিক্ষা... রগরগে ব্যবসা... বেশিরভাগটাই ওস্তাদের দখলে যদিও, মতলবের মধ্যে তাই অহর্নিশ খচখচ।... ওভার ব্রিজের ওপর দাঁড়িয়ে, ওস্তাদ তাকে এই শহরের উঁইয়ের মতো কিটকিটে রিকশা দেখায়... এদের জন্মবৃত্তান্ত, সারা দিন কষ্ট, কষ্টের ফল... তার পাথরখচিত আঙুল চলে যায় প্রকাণ্ড বিল্ডিংয়ের দিকে, সে পানঢোক গিলে মতলবকে জানায়, মাসে পঞ্চাশ লাখ টাকা যাদের ইনকাম, তাদের চাকরেরা সারাদিন কুকুরখেটে পায় একশ' টাকা।

কী কালা তুফান আইল যে এই শহরে! টিনের চালটা যখন উড়ি উড়ি, মতলবের কলজেতে ভয় নেই, কেবল বিরক্তি, এই রকম আসন্ন বৃষ্টির ঘ্রাণ তাকে ঝাপসা ঝাপসা স্মরণ করিয়ে দিতে চায় স্ত্রী-সন্তানের মুখ। একবার যা পেছনে ফেলে আসে, কোনো অবচেতন রক্তাক্ত ক্ষরণ থেকেও মতলবের সেই পা পেছনে চলে না। নিজের জন্ম, বিয়ে সন্তান কিস্‌সু তার ইচ্ছে অথবা স্বপ্নমতো হয় নি। ঠোঁটে লকার এঁটে সৃষ্টিকর্তার কারণে পয়দা হওয়া মানুষ হিসেবে হেঁটেছে, ঘুমিয়েছে। কিন্তু রাতদিন তার ভোঁতা কোষে নতুন পানির পোনা সাঁতরায়— মতলব, এই জীবনে কোনো মজা নাই... কী নিথর মহুয়ার ঘ্রাণ ইন্দ্রিয়ে ইন্দ্রিয়ে আগুন ধরায়—আব্বা আ আ... বলে ছোট ছেলে যখন কেঁদে ওঠে, নিজের অন্তরাত্মার ভূমণ্ডল ফুঁড়ে সেই মতলবের প্রথম ঘেন্না— ক্যাডায় তর আব্বারে! আমি কেউ না... কেউ না... বদতুফানের লগে আমি উড়ুম... সেয়ানা মাইয়াগো শইল্যে জিন হৈয়া আছর করুম।

শেষ দিকে গ্রামে তব্দা লেগে বসে থাকা লোকটাকে দেখে স্ত্রীর সন্দেহ যখন ঘনীভূত হত, স্বামীটা আসলেই পাগল হয়ে যাচ্ছে কিনা... তখন প্রখর বন্যা... স্ত্রীর কণ্ঠে কুণ্ডলী পাকিয়ে পাকিয়ে হাঁটতে থাকা মনসা—।

একটি ঘুচঘুচে ক্লেদাক্ত গলির যে কক্ষে বসে তার নগরের ভাত, কাপড়— সেটাকে কক্ষ না বলে চিপাচিপি টয়লেট বলাই উত্তম— পার্থক্য, এটাতে কমোড নেই। টেবিল পেতে বসে দিনভর সিগ্রেট টানা আর আতিপাতি শ্যেনচক্ষু পেতে অপেক্ষা— কখন নেশাপাগল চেনামুখের কাস্টমাররা আসে। স্থানীয় পুলিশ, মাস্তানদের ভাগ দেয়ার পরও ফেনসিডিল বলে কথা, রিস্ক আর লাভ দুইটাই মার মার কাট কাট... মালিকের ব্যবসাটা বুঝে যাওয়ার পর দায়িত্বশীল কর্মকর্তা আর সেলস্‌ম্যানদের যেমন ভেতর জ্বলুনি হয়— হালা, ট্যাকা থাকলে আমারে একশ' দিয়া তুই পাঁচ লাখ ? আমার বুদ্ধি আর কেরামতির কল্লাডার মইদ্যে ঠ্যাং রাইখ্যা কিনা তুই... ?

সেই জ্বলুনি অহর্নিশি মতলবের মধ্যেও বলক তোলে। ওর ওস্তাদের ব্যবসা শহরের এ রকম অনেক অলিগলিতে বিস্তৃত। তারপরও অন্য অনেক শাখাপ্রধানদের না নিয়ে ভারি মৌজের সময়টাতে ওর ওস্তাদ ওকে যখন নিজের বিনোদনের বিশ্বাসী সঙ্গী করে, তাতে বেতনভুক্ত মতলবের যন্ত্রণার মধ্যেও চটক টসটসিয়ে ওঠে। বিরাট পর্দায় ব্লু ফিল্ম দেখে একদিন মালিকের পাশে বসে যখন মতলব শরমে কাহিল, ওর উরুতে বড় রসিক চাপড় মেরে মালিক বলে— তর অবস্থা তো বেগতিক রে, ল, আসলডাত যাই!

মতলবের কোঁকড়ানো দেহ যত কাঁথার নিচে গুটিগুটি, তত বাইরে লাগামহীন বৃষ্টির চিরচিরানি। প্রভাতে উঠে মতলব দেখবে প্যাক পানিতে বাড়ির সামনেটা গলা সমান ডুবে আছে। সেই গন্ধের তোপ তার চৌকির নিচে ঢুকে তাকে বিদিকিচ্ছিরি এক নাওয়ের মধ্যে বসিয়ে রাখবে। পাশের বস্তিতে যেন মরণ নেমেছে।

রাতভর হাউকাউ করা মানুষগুলো কি এ-ই শু গন্ধের মধ্যেও হেমন্তের বাতাস নাকে পেয়ে টাসকি মেরে আছে ? টিনের চাল বেয়ে বর্ষার আহারে সে-কী জীবনবিনাশী রোদন! বেড়ার সাথে টেপ লাগানো লাইটের বাল্ব রাংতায় মোড়ানো। এরই বিচ্ছুরিত আভায় সে চারপাশ ভুলে যাওয়া বিলাসিতায় কত কায়দায় যে নিজের হাত-পা দেখে!

মতলব মতলব রে...। তুফানে যে বেবাক ভাসায় নিল... আন্ধারের কুণ্ডলী থেকে খনখনে দাদির কণ্ঠ আতকা কোত্থেকে উড়তে উড়তে আসে... দু'হাত দিয়ে সে কান চেপে বন্ধ্যা চোখ দুটো প্যাঁচপ্যাচে তুলোর মধ্যে ঠেসে দিতে থাকে। ফিনকি দিয়ে ওঠে বেহুলার দেহ... একেবারে উদাম। বৌকেও সে কখনো আস্ত দেখে নি... ওস্তাদ যখন তার চিহ্নিত রূপসী নগরীর কোঠার দিকে যাচ্ছে, ওকে নিয়ে টানাহেঁচড়া চলছে বেশ্যাদের মধ্যে, তখন ওস্তাদকে টাসকি মেরে দিয়ে বেড়ায় হেলান দিয়ে কঠিন চোখে ওর দিকে তাকিয়ে থাকা সবচেয়ে কুৎসিত মেয়েটাকে সে পছন্দ করে।

নিজের কল্পনাশক্তির তারিফ করে মতলব। মেয়েটার চোখের কাঠিন্যই তাকে টানছিল, আর পাঁচটা মেয়ের মতো ও ভাতের খিদায় নিজের দেহ দেয়ার জন্য ওর সাথে ফক্কিন্নিদের মতো ব্যবহার করে নি। বেশ্যা যদি বিছানায় গিয়ে বেশ্যাপনাই না করে, ঘরের বৌ-য়ের সাথে তার পার্থক্য কী !

থ্যাবড়া, মোটা, থলথলে শরীর, চেপ্টা নাক, এর নিচেই ল্যাপটানি কাজল আর দিশি পাউডারের গন্ধ! ওস্তাদ যতক্ষণ ওই ঘরে, এই ঘরে মতলবের ততক্ষণই ফিরি আধিপত্য! সে ওই বুলু ছবি দেখার মতোই মেয়েটাকে নানা কায়দায় ব্যবহার করতে করতে জীবনের চরম মৌজের আনন্দে শিস দিয়ে ওঠে— হালার বউয়ের টিং টিংঙ্গা শইল্যের সাদা দেখতে দেখতে শইল্যের মইদ্যে গিঁটটু জইম্যা গেছে, কালা শইল্যের মইদ্যে যে আন্ধারের মজা... হেই মজা কি আর...!

দরাম... কাঁথার তলা থেকে কাঁপতে কাঁপতে উঠে বসে সে। ঘরের পাশের নারকেল গাছের ডালটা তার চালে তো নয়, সাক্ষাৎ যমদূত হয়ে যেন তার কলজের ওপর আছড়ে পড়ল। তার তিল তিল হতে থাকা লোহাদৃঢ় শিরদাঁড়া আচমকা এক কাঁপন খায়। বাইরে ঝড়ের গর্জন নেই, শুধু হুহু শীতগন্ধের শিরশিরানি... তাহলে ? লাল-নীল আলোয় কী এক কুহকে বিছানা হাতড়ায়।

বিভ্রমের জাল ছিঁড়ে যায় তিতকুটে এক বিস্বাদে। কানা পোলার নাম পদ্মলোচন! বেশ্যার নাম আবার বেহুলা! নাগরীর শরীরের কারিশমায় পাগল হয়ে মতলব যখন তাকে বিয়ে করে ঘরে আনে, ক্ষণ আগের শ্যাওলা খসিয়ে বেহুলা কুলবধূ হওয়ার স্বপ্নে বিভোর হয়ে পড়ে।

শ্যাম্পু চুলে চিপচিপা করে নারকেল তেল মাখে হাঁস মার্কা, যে গোল নাকছাবিটা তার চেহারার মধ্যে একটা খ্যামটা ভাব এনেছিল সেটাকে উড়িয়ে ফেলে লম্বা শাড়িতে গতর ঢেকে জবুথবু সলাজ হাঁটে।

এদিকে ব্যবসাপাতির অবস্থা খারাপ। চেনামুখ ছাড়া সাধারণত মতলব কাউকে ফেনসিডিল দেয় না। পাড়ার রেগুলার কাস্টমার এক বড় সন্ত্রাসীদের সাথে এক লোক এসে অর্ডার দিয়ে যায় পাঁচ শ' 'আট ইঞ্চির'। ব্যাটা 'আট ইঞ্চি' 'ডাল' এসব শব্দ ব্যবহার না করলে তা-ও কিছুটা সন্দেহ হতো তার। বলল সন্ত্রাসীর বাড়িতে সন্ধ্যায় পার্টি হবে। অন্যত্র লুকানো বাক্স থেকে, মাটির তল থেকে সন্ধ্যায় সব প্যাকিং করে এখানে আনার পরই পুলিশের হামলা। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নিজে ছিল মোড়ের গাড়িতে, সন্ত্রাসীর সাথে ছিল ডিবির লোক! মতলব তো গন্ধ পেয়ে পিছন দরজা দিয়ে লাপাত্তা! সাথেরটাকে ধরে নিয়ে গেছে, নব্বই দিন হাজতে পড়ে থাকার পর বিচার!

লুকিয়েচুরিয়ে কিছুদিন কাটিয়ে, মাথান্যাড়া করে লেবাস পাল্টে ফের ওস্তাদের চরণতলে। ওস্তাদ আশ্বাস দিয়েছে, কিছুদিন গরমিডা যাইবার দে। চাকরি না থাকলে কী হবে। ওস্তাদের সাথে তার আনন্দ বিনোদন ঠিকই চলছে! এর মধ্যেই এক মাথা গরম করা চিরিকের ফেরে পড়ে কী করে সে বেশ্যাকে বিয়ে করে ফেলে নিজেও বুঝে উঠতে পারে না!

কচি লাউডগা ফেনিয়ে উঠছে মাচার পথ ধরে। আসন্ন শীত বৃষ্টির ভূত মতলবের নিশ্বাসে নিশ্বাসে, শিরায় শিরায় কী জানি কী করে। প্রভাতে জেগে ওঠা ভাসমান নগরীর হাউকাউয়ের মধ্যেও মেঝে ছলছল জলের দিকে তাকিয়ে সে বুঁদ হয়ে থাকে।

স্ত্রীর গলায় পেঁচিয়ে উঠছে সাপ, সন্তান তিনটি ঘুমন্ত অবস্থায় শুকনো ঠোঁট চাটছে। লোকজন দিয়ে তার গ্রামের স্ত্রী-ও আড়িপাতি খোঁজ লাগিয়ে স্বামীর ঠিকানা পেয়ে দু'দিন পর পর একে ওকে দিয়ে তাকে খবর পাঠাচ্ছে। শেষে হুমকি দিয়েছে— দু'একদিনের মধ্যেই সে সন্তানসহ তার মাথার ওপর এসে বসবে।

নাহ্... এই এলাকা ছেড়ে অন্য কোথাও ঘাপটি মারতে হবে, তখনো বৃষ্টিটা অত জাঁকিয়ে নামে নি। কিন্তু যত রাত বাড়ে, তত তার মাথার কোষ পাগল বাতাসের চারণভূমি। নিজের ওপর ঘেন্না জমে। নিষিদ্ধ জিনিসের দিকে প্রতিনিয়ত হামলে থাকা সত্তাটাকে মনে হয় গনগনে চুল্লির মধ্যে ঠেসে দেয়।

আহারে বেহুলা!

মনে পড়ে মতলবের, বিয়ের পর পর তার মধ্যে অগ্নিচুল্লির লড়াই। একটাই ঘর, ল্যাপটালেপটি ফেনসিডিল ব্যবসার বন্ধুবান্ধব, বৌ-কে সে পায় না। এদিকে তার তহবনের খুঁটিতে টান পড়েছে, ওদের যদি যাওয়ার নাম থাকে! ওস্তাদের চ্যালা সব শালা।

ক্ষণে ক্ষণে ধিকিধিকি দিয়ে ওঠে নিকটবর্তী স্মৃতি। প্রভাত প্রগাঢ়তর হতে থাকে। বৃষ্টি এখন বিরাম নিতে গিয়ে হাঁপাচ্ছে। তারই নিশ্বাসের জল রাঙা আলোর ধারা বেয়ে বেয়ে মতলবের কাঁথা ভিজিয়ে দিচ্ছে। আত্মীয়রা চলে গেলেও বেহুলার বদল নেই। আজব মেয়েলোক, স্বামীর কাছে ভাত-কাপড় কিস্‌সু চায় না, কুলবউ হতে চায়। বিছানায় রাঙা আলোর নিচে মরাটে বাইম মাছের মতো গতর বিছিয়ে তার গড়ানি আছড়ানি ফুসফুসানি কান্না— আমারে ওই লাহান চাইয়ো না, ওই লাহান ঢং আমি দশ মরদের লগে করছি... এরপর ভোরে গোসল সেরে চা, ভাত খেতে বসলে পাখা দিয়ে বাতাস করা...

মতলবের ভেতর ঠেলে বমি উঠতে থাকে, এই রকম ম্যাদা মার্কা বেশে কোনো কালীভূতি মাগিকে কারো সহ্য হয় ? লড়াইটা ভেতরে ধিকধিক এ জন্য, ভেতরে সহসা চাগিয়ে ওঠে এক্ষেত্রে গ্রামে ফেলে আসা স্ত্রীর বাঁশপাতার মতো কম্পিত মুখ! ওস্তাদের বাড়িতে বউকে নিয়ে বড় স্ক্রিনে ছবি দেখে হলে বাংলা ছবি দেখতে যায় দু'জন একসাথে। ততদিনে রাতের স্যাঁতসেঁতে বিছানায় সে ক্রমশ নেতিয়ে পড়ছে, এই ছবিতে হেভি একটা রেপ সিন আছে। বেহুলাকে কানে কানে বলে— আমার লগে বিছানায় এই রকম নাটক করবি, আমি তরে টানতে থাকুম... তুই ওই দেখ, ওই মাইয়াডার মতোন আছারি বিছারি করবি। বড় স্ক্রিনের এই রগরগে দৃশ্যে সে যখন উত্তেজিত, ডরভয়ে কাতর বেহুলা মূর্ছা যায় যায়।

সেই রাতেই মাগিকে রাস্তার মধ্যে লাথি দিয়ে ফেলে মতলব নিজের দরজা এঁটে দিয়েছে। রাতভর গা ছমছম বিরক্তি, এই বুঝি বেহুলা বিড়ালের মতো পিলপিল হেঁটে ওর দরজায় আছড়ে পড়ে!

সেদিন প্রভাত রোদ্দুরে মতলব হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেও ভেসে উঠেছে পতিতাপল্লীর ঘরের সামনে দাঁড়ানো বেহুলার কঠিন চোখ। তখন বুকের ভেতর তার অন্য এক অনুভূতি শিরশির করেছে, শরীর বিকোলেও বেহুলা নিজ চরিত্রের দেমাক বিকোয় নি।

আর আসে নি সে মতলবের জীবনে।

মুক্ত জীবনে এরপর ফের ফেনসিডিলের ব্যবসায় ওস্তাদ বড় ধাক্কা খেয়ে একেবারে মরণ ভাগা দিশে...একদিন জব্বর ধরা খেয়ে আহারে! পুলিশের হাতে এমন মা'র খেলো, আস্ত মেরুদণ্ডটাই বাস্তবিক অর্থে ভেঙে কুঁজো হয়ে গেল। এরপর থেকে দিন রাত মাস গড়ালে নানা ফিকির করে জীবন বাঁচাতে বাঁচাতে এই টিয়ে পাখির ব্যবসা। কিন্তু মানুষ চালাক হয়ে গেছে। কোনোরকমে এই টাকায় পেটটা চলে কিন্তু ঘরের ছাদ মেলে না।

তন্দ্রায় গুমড়ে গুমড়ে ওঠে মতলব... তার পাশে শুয়ে আছে রাখাল... শেফালিকে সে কি বেহুলা ভেবেই গ্রহণ করেছিল? চারপাশে ধুধু বাতাস... সে শুনতে পায় নিদ্রাহীন রাখালের গান— আমি একদিনওনা দেখিলাম তারে...।

সে ধাক্কা দেয়... এই গুমাইতে দিবি?

রাখাল নিচে পড়ে গিয়ে আবার চেষ্টা করে নিজের জায়গা দখল করার, আপনি এই সব কী করেন? আপনের মতো আপনি থাকেন, আমার মতো আমি...।

দূর... মতলব কাঁচুমাচু হয়ে ঘুমিয়ে পড়ে।

উড়াল বাতাসে দরদর করে এমনই একটি গগনব্যাপী লক্ষ পাতাসহ দাঁড়ানো প্রাচীন বটগাছের নিচের তক্তপোষে তাদের বাস। হাসপাতাল থেকে জোসনার ধবল মুখরতা কিংবা বিচ্ছেদের রক্তাক্ত বেদনা নিয়ে ঢেউ খেতে খেতে, পাক খেতে খেতে প্রথমে শহরের একটু এই প্রান্তের বৃক্ষটির নিচে রাখালই আশ্রয় নিয়েছিল। কিন্তু ক্রমে ক্রমে নিজ চাতুর্যে আর রাখালের বোদাই স্বভাবের সরলতায় তারই পাশে রাত্তিরে চিপাচিপি আশ্রয় নিয়েছে মতলববাজ। প্রথমে মিনমিনে কণ্ঠ ছিল তার, আরে ভাই, আপনি ব্যবসা করেন, ঘর রাইখ্যা ক্যান আপনি রাস্তায় আইসা পড়লেন ? ভিখিরির এই কথায় একেবারে চিড়েভেজা কণ্ঠে বলত, ব্যবসা ভালো যাইতাছে না ভাই, ঘরভাড়া বাকি পড়ায় বাড়িওয়ালা ভাগায়া দিছে।

এইখানে তো শুনি ভালোই হাঁকডাক আপনের।

বুঝলে না... রাখালকে এক্কেবারে ব্যক্তিত্বের ন্যূনতম ভাঙাচূড়া অতলে ফেলে বলে মতলববাজ, ভিক্ষুক গো আইজকাইল পয়সা অনেক, অন্ধ, ল্যাংড়া হইলে তো কথাই না। তা আমার তো অন্ধ, ল্যাংড়ার যোগ্যতা নাই, বুঝলা, তুমি তো ভাইজান এই ব্যাপারে ফার্স্টক্লাস ফার্স্ট যোগ্যতার, তো এই গাছের তলে ক্যান ?

কী করে বলবে রাখাল, যখন সে ফের জীবনের নতুন পথে উল্টিপাল্টি ঢেউ খেয়ে কোথাও নিজেকে জুৎ করতে পারছে না, এই গাছের নিচে এসেই পাশের শস্যক্ষেতের ধেইধেই ঘেরাণে সে মা'র বুকের গন্ধের, জোসনার হাত স্পর্শ— মায়ার গন্ধে কী আরাম জিরোনই না দিয়েছিল।

আসার আগে জোসনা বলেছিল, আমার বাবা মা দুজনাই জন্মান্ধ আছিলেন। আমার চক্ষু দিয়ে তারা পৃথিবী দেখত, আর আমি তাদের চোক্ষে দেখতাম পৃথিবীর অসীম মায়া... এরপর কথা এগোয় নি। জীবনের মায়ায় না পড়ার বাঁধনে যখন দুজনের বিদায়ী হাত দুলছে, তখন জোসনা বলে, তোমাকে আর ভিক্ষা করতে হইব না, তুমি বাঁশি বাজাইবা, আর বেবাক মানুষ তা শুইনা তার সম্মানী দিব। কেন এই ভিক্ষার জীবন তুমার ?

জোসনার মুখে ফের তুমি সম্বোধনে ভেতরটা অপার্থিবতায় সহসা ভরে উঠলেও ফের দুমড়ে গেছে, হায় বাঁশি! সেই সুর কি আর মনে আছে ? তবে একবার সাঁতার জানলে মানুষ অনেক অতল পানিতে পড়ে পানিকে প্রথমে ভয় পেতে পারে, কিন্তু সাঁতার ভোলা তো অসম্ভব।

কিন্তু সে-তো তার বাঁশিকে অনন্তে ছুড়ে দিয়ে জীবনের অনেক দূর পথে চলে এসেছে। না, আর ফেরা যাবে না।

আমার তো ঠিকানা নাই। এই জীবনে কী কইরা আর জানা হইব আমরা কে কেমুন আছি ?

অতল ওপান্তর থেকে ভেজা কণ্ঠে বলে ছিল জোসনা, আমার ভেতরে যে গান করে লালন, তোমার ভিতরে যে কান্দন করে লালন— হেই দেখা করাইব।

'আর কী হবে এমনও জনম বসব সাধু মিলে, হেলায় ফেলায় দিন বয়ে যায় ঘিরে নিক কালে...।'

বৃক্ষ বাতাসে তুফান ওঠে।

মা'র শাড়ির রঙ সবুজ আছিল,

বাপ হাসির রঙ মধুর আছিল।

জোসনার রঙ... ?

কী হইছিল জোসনার ? কুথায় তার অন্ধ বাবা মা... ভেতর উত্থিত রাখালের এই প্রশ্নের পরেই আকাশের হিম ধরে বৃক্ষ পাতার সবুজ গড়িয়ে শীত রাত নেমে আসে।

সকাল হয়।

রাখাল ভিখিরি থালা নিয়ে নিশ্চল বসে। আর পাশে মতলববাজ তার সমস্ত দেহ আর মনশক্তির চিৎকারে শুরু করে তার টিয়ে ব্যবসা জাদুর কেরামতি। তার সামনে রাজ্যির চিঠি। একটি টিয়ে পাখি হাঁটে চিঠি খামের ওপর দিয়ে। সামনে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করছে এক ভদ্রলোক, যেন সতর্ক চোখে নিজ জীবনের আগাপাস্তলা মেপে জেনে নিতে চাইছে। ভদ্রলোকের হাতে আজকালকের জমানার সস্তা 'দশ' টাকার নোট। টিয়ে পাখিটি এসে একটি চিঠি মুখে তুলে নেয়। চিঠিটি যখন মতলব মিয়া হাতে নিয়ে ঠোঁটে নানারকম হাসির ভঙ্গি নিয়ে নিশ্চুপ... রাখাল ভাবে হে সৃষ্টিকর্তা, বধির হোক আমার কান, কিন্তু পরক্ষণেই টুং শব্দের ফকিন্নি টাকা নয়, তার হাতে যখন কেউ গুঁজে দেয় পাঁচ টাকার নোট বলে, দোয়া কইরেন, বড় চাকরির ইন্টারভিউয়ে যাচ্ছি... প্রথমে পাঁচ টাকার নোটের ওজন বুঝে লুঙ্গির সাবধানী কুঁচকিতে তা রাখতে রাখতে সে অসীম দোয়া করে দানপ্রার্থীর প্রতি... তখন অপরপাশের ভদ্রলোকের সামনে টিয়া পাখি কী তুলল ? ভীষণ সহনীয় মতলববাজ নাটকীয় ভঙ্গিতে নিশ্চুপ।

এরপর তাকে আর নিঃশব্দ টেনশনে না রেখে মতলব বলে, প.. র.. ম সৌভাগ্যবান। ফের থেমে সে শহুরে কায়দার দক্ষ ব্যবহার ঘটানোর চেষ্টা করে, ইমপসিবল লেখা। এমন সৌভাগ্য ক'জন মানুষের হয় ?

লোকটি নানারকম বিভ্রান্তির মধ্যেও কিঞ্চিৎ উত্তেজক, শুধু এইটুকুই ?

এই এলাকাতেও এইসব টিয়েপাখির কায়দাকানুনের প্রতি আগ্রহী মানুষের ক্রমশ ভিড়। মতলববাজ তার রপ্ত করা তীব্র চোখ ভদ্রলোকের প্রতি বিস্তারিত করে, আরে আপনে হইলেন শিক্ষিত মানুষ, ক্যান জানেন না, অল্পে কইলে মর্দে বুঝে, বেবাকটুকু কইলে অবলাও বুঝে না।

ভদ্রলোক এরপর বেশ ইতস্তত কণ্ঠেই বলে, অবলা মাইয়াদের অত অবহেলা কইরা ক্যান কথা কন ? মাইয়া জাতি যা পারে...।

ও বুঝছি ভাই, মতলববাজ কায়দা পাল্টায়, মাইয়া জাতিরে শ্রদ্ধা করেন আপনি, নাকি ডরান ?

আরে, আপনে আমার ভাগ্যে যা দেখছেন, তাই কন।

আচ্ছা! আচ্ছা! এইবার খানিক ঝিম মারে মতলববাজ। আর রাখাল ভিখারি প্রথমে তার অবস্থা দেখে ভেতরে খানিক দমকে হাসে, শেষে গায়, খাঁচার ভিতর অচিন পাখি কেমনে আসে যায়... বলে নিজের শূন্য থালায় হাত বোলায়।

মতলববাজ বলে, আরে ভাই, আগেই তো কইছি, আপনে হইলেন গিয়া শিক্ষিত মানুষ। হের পরেও মানুষ যদি বেবাক জানত, সবচেয়ে আগে জানত তার মরণের আর কত বাকি ? এক মিনিট না এক যুগ ? আপনের মনের ইচ্ছাশক্তি অনেক। আমি তো নিমিত্ত মাত্তর, যা করতাছে হেয় হইল আসমান অরণ্যের উড়াল পক্ষী। হেয় যা তুলছে, আপনে পরথমে এই দেশের এমপি হইবেন, আর আস্তে আস্তে...।

আরে শালা চাপাবাজি করছ ? লোকটির মুখ ক্ষেপে রক্তাক্ত হয়ে ওঠে, আমি তোদের ধান্দাবাজি দেখতে চাইছিলাম। আইজ পাঁচ সাত বছর ধইরা একটা চাকরির জন্য জীবন এসফার-ওসফার করতেছি... ফুঃ শালা এমপি... পলিটেশিয়ান, রাজনীতিরে আমি ঘেন্না করি, ইচ্ছাশক্তি ? খাড়া, বাঁচলে তোদের নামে পত্রিকায় ধান্দাবাজির রিপোর্ট লিখব। তোদের ব্যবসার লাল বাত্তি জ্বালাব— বলে লোকটি গিজগিজ করে চলে যেতে উদ্যত হলে গলা চড়ায় মতলববাজ, আরে ? ট্যাকা দিবেন না ? আপনের জীবন লাটে উঠছে বইল্যা আমার ব্যবসায় পানি ঢালবেন ?

পুলিশ ডাকমু ? বলে মতলববাজের ঈর্ষান্বিত চোখের সামনে রাখালকে দু'টাকা দিয়ে ভিড় অরণ্যের জাগতিক ভিড়ে হারিয়ে যায় ভদ্রলোক।

নিজ ঘরে রাত্রির গানে উদ্বেলিত জোসনা যখন জানালার কাছে যায়, আন্দাজ করতে পারে না রাত্রির বয়স কত ? হ্যাঁ! মানুষের জীবন! অন্তরাত্মা থেকে এই হাহাকার গলা উজিয়ে বের হওয়ার আগেই ধুঁকতে ধুঁকতে প্রচণ্ড ব্যথায় বুক ফেটে যাওয়ার আগেই যেন বা সেটাকে বিন্যস্ত অথবা জোড়া লাগাতে দু'হাত বুকে চেপে বিছানায় উপুড় হয়।

রাখাল... তুমি বাঁশি বাজাও না কেন ?

ছটফট করতে করতে নিজের প্রাণ উত্থিত প্রশ্নে সে আকুল কান্নার শুরুতেই শুনে সুর— সময় গেলে সাধন... হবে না... অমাবস্যায় পূর্ণিমা হয়... কেন সে ওই ছিন্ন রাস্তার এক অন্ধ ভিখিরিকে এতটা স্বপ্ন দিল ? সে কি তার বাবা-মা অন্ধ ছিল বলেই ?

না, মানুষটার মধ্যে সে লালনকে দেখেছিল। প্রথমত তার বিধ্বস্ত রূপের মাঝেও ক্রন্দনহীন চেহারায়, যেন বা অনন্তে তাকিয়ে থাকা চক্ষু... দ্বিতীয়ত, তার লালনের গল্প করতে করতে ভীষণ নিঃশব্দ তাচ্ছিল্যে জোসনার কাছে নিজেকে ঠিকানাহীন ফেলে এই পৃথিবীর অনন্তে হারিয়ে যাওয়ার অনন্য ব্যক্তিত্ব। একজন ভিখিরির চোখ কী করে এত আপোসহীন তীব্র হয় ? তার দেহ সুঠাম হয় ? আবারো আগের ভাবনাই তার রাত্রির ভাবনাকে মুড়িয়ে মুড়িয়ে নিজের মধ্যে বিন্যস্ত করে, না, ও ভিখিরি না। ও ছদ্মবেশে জন্ম নেয়া দুর্দান্ত লালন। নইলে স্রেফ পথ ভিখিরির কী করে এত ধৈর্য হয় ? অসহনীয় মারপিটের রক্তাক্ত ভাঙনেও যাঁর চোখ থাকে জলহীন ?

যার কথা ভীষণ সরল কিন্তু জাদুকরী ? জোসনার জন্মান্ধ বাবা মা-ও তো ভিক্ষেই করত। এই পৃথিবীর বাস্তবতায় যেখানে একজন চক্ষুষ্মান লোককেও জীবনের পরতে পরতে হোঁচট খেতে হয়, সেখানে কী করে তার বাবা যা— সেই দু'জন মানুষের মন চক্ষুর মিলন হলো, কী করে দু'দেহের মিলন হলো, কী করে তাঁদের কোল জুড়ে এলো জোসনা মেয়ে ?

অবশ্য শৈশব থেকে মোটামুটি যৌবন অব্দি তাদের হতদরিদ্র বাবা-মা তাদের মুখে দু'মুঠো অন্ন, নুন পানি খাইয়ে খাইয়ে বড় করে। জোসনার নানা-নানু বার্ধক্য রোগে ভুগতে ভুগতে মারা যায়। আর তার দাদাও কঠিন রোগে ভুগে অন্য ছেলেদের ঘাড়ে ভর করায় জোসনার বাবা ছিটকে পড়ে এই পৃথিবীর নিষ্ঠুর একাকী বাস্তবতায়। যাহোক জোসনা বড় হতে হতে শুনেছে, দু'জন অন্ধ বাবা-মা'র সন্তান হয়ে জোসনার চোখও হবে অন্ধকারাচ্ছন্ন, এই ভয়ে শিশুটি ভূমিষ্ঠ হয়ে একটু একটু করে বড় হওয়ার আগ পর্যন্ত কী মর্মান্তিক আতঙ্কেই না ভুগত দু'জন! এ শহরের আসমান ছিল তাদের

ছায়া, মাটি ছিল তাদের শয্যা। যখন জোসনা অবুঝ আকুল দুটো হাত দিয়ে বাবা মা'র মুখ ছুঁয়ে বলত, প্রথমে মা... বাবা ডাক, পরে আমাল আব্বা সুন্দল... আমাল আম্মা সুন্দল... অপার্থিব আনন্দে ভেসে যেত তাদের মন।

এরপর ক্রমাগত মেয়ের চোখ দিয়েই তারা এদেশের গাছপালা পথঘাটের রূপ দেখতে পেত। কিন্তু এরকম চক্ষুষ্মান একজন কন্যাও বাবা-মা'র দৈন্যের কারণে তাদের মেয়েও পথের ভিখিরি হবে, এই নিয়ে যখন আকুল কান্নায় স্বামী-স্ত্রী ভাসতে থাকত, তখন একদিন পথের ধারেই যেন দেবদূত... এইভাবে এক গাড়ি থেকে নামলেন এদেশের এক ধনাঢ্য মহিলা। অনেক গপ্পোচারের পর তিনি জোসনাকে পড়াশোনা করানোর দায়িত্ব নিলেন।

প্রগাঢ় রাত্রে মোবাইলে গান বাজে... নাম্বার দেখে শিরশির করে জোসনার বুক। হাসপাতালেরই ডাক্তার পরিমল দত্ত। জোসনার প্রতি তার আকর্ষণকে কিছুতেই যে লুকাতে পারে না, সেই ফোনে কান পেতে জোসনা কম্পমান... ঘুমোন নি ? এত রাত জাগলে দিনে রোগী দেখবে কে ?

জেগে তো থাকো তুমিও, তুমি সারাদিন ডিউটি করো কী করে ?

হিম হিম কাঁপে হাত, কানের কাছে মোবাইল তো নয়, শুকপক্ষী, হুট করে উড়াল দিয়ে কণ্ঠ নিয়ে যায় পরিমল দত্তের কাছে।

জোসনা বলে, আমি আর আপনি এক হলাম ? আমি ধূলিকণা, শুকনাপাতা, মাঠে ময়দানে দিনরাত আমার উড়াল, আমার আবার ঘুম নির্ঘুম! প্লিজ আপনি ঘুমিয়ে পড়ুন, কাল হাসপাতালে দেখা হবে।

এমন কবিতার মতো কথা বললে ঘুমাই কী করে ? নিজেকে এত ছোট করে বলে বলে কী করে যে এড়াও আমাকে অবাক লাগে, তখন ঘরে লালনের কণ্ঠ ছড়ায়িত— 'পাপ-পুণ্যের কথা আমি কারে সুধাই... এই দেশে যা পাপ অন্যদেশে পুণ্য তাই...।'

ঠিক আছে তুমি লালন শোনো... আমি... সরি, বিরক্ত করলাম, পরিমল কথা কেটে দিলে গভীর রাত্রি জানালার ঘুমন্ত নগরীর নিভু নিভু বাতির মধ্যে চোখ রেখে কঠিন বিষাদে ডুবতে ডুবতে দেখে জোসনা, এর মধ্যে জ্বলজ্বল করছে দুটি আলোক খণ্ড... যেন বা রাখালের নিদ্রাহীন চোখ।

এই দিগন্ত জোড়া শহর হুজ্জাতের ভিড়ে রাখাল তুমি কোথায় আছো গো ?

জোসনার ভেতর উত্থিত প্রশ্ন শেষ হতেই আলোকবর্তিকা ছায়া করে কুয়াশাভেজা বৃষ্টির ঝিরঝির পতন শুরু হয়।

মধ্যরাত। রাখালের ঘুমন্ত উষ্ণ তপ্ততায় হঠাৎ শীত নামে। সে প্রথম চমকের পর হিম শীত দেহে অনুভব করে তার পা পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে একটি সাপ উঠছে। মুহূর্তে রাখাল নিশ্বাস প্রাণহীন মরা গাছের নুড়িতে রূপান্তরিত হয়।

অকস্মাৎ... সাপ সাপ বলে মতলববাজ এমন চিক্কোর দিতে শুরু করে, রাখালের মরিয়া স্বয়ংক্রিয় হাত শরীর থেকে সেটাকে সজোরে টেনে দূরে ফেলে এমন আতঙ্কে ছুটতে থাকে, বেশ খানিকক্ষণ পর একটি জায়গায় স্থিত হয়ে লম্বা শ্বাস নিয়ে অনুভব করে, সমস্তদেহ দগদগে ঘামে ভিজে গেছে। আর দিকবিদিক ছুটতে থাকায় অকৃষ্ট রাস্তার ভাঙচুরে তার পায়ে হাঁটুতে, কখনো ওষ্ঠা খেয়ে পড়ায়— হাত, কনুইয়ে ফালাফালা হয়ে ঘামের সাথে চামড়া ফুঁড়ে ভেসে উঠতে থাকা চাপ চাপ রক্তে সর্বাঙ্গ ভেসে যাচ্ছে।

কিছুদিন হাসপাতালে থেকে জোসনার সেবায় শরীরে আল্লাদ জমেছে। ফলে, এইটুকু আঘাতেই সমস্ত অস্তিত্বে এমন জ্বলন পুড়ন শুরু হয়, রীতিমতো কান্না পেতে থাকে রাখালের।

সাপটা কি এখনো তাড়া করছে তাকে ?

ভয়ে ভয়ে পিছু হটতে হটতে টের পায় একটি গাছের মধ্যে তার পিঠ ঠেকেছে।

এত যন্ত্রণার মাঝেও সে দু'হাত মেলে রাত্রির দশা বুঝতে চায়। অমাবস্যা না পূর্ণিমা ? কিছুক্ষণ দু'হাত ঘুরিয়ে মুড়িয়ে হাতের মধ্যে সে চন্দ্রালোকের ঘ্রাণ পায়। জ্বলনতপ্ত শরীর নিয়ে সে প্রার্থনা করে, হে চান্দের আলো, তোমার হলদি আমার বেবাক শরীলে মাইখ্যা আমার জ্বলন কমায়া দেও।

এইসব বলতে থাকে আর হিম দেহে প্রতীক্ষা করতে থাকে মতলব মিয়ার পদশব্দের। প্রহরের পর প্রহর যায়, মতলব মিয়া আসে না।

ক'দিন ধরেই অবশ্য মতলব মিয়ার মতলব বোঝা যাচ্ছিল না। রাতে তার পাশে শুয়ে থাকা কাঠ শরীরের মতলবের মধ্যে যেন যৌবনের জোয়ার বইতে শুরু করেছিল। তার পাশেই শুয়ে রাত নাগরী শেফালীর সাথে সে কী রঙ ঢং তামাশার শব্দ। একই বিছানায় ঠাসাঠাসি অবস্থায় পয়লা পয়লা সেই নাগরী তক্তপোষ থেকে মতলবের সাথে গড়াগড়ি মাতমে কখনো ঝপাৎ ঝপাৎ মাটিতে পড়লে নাগরী ঝাঁঝিয়ে উঠত, আরে পাশে একটা ব্যাটা শুইয়া থাকে, এইটুকু জায়গা, তুমি অন্য জায়গার ব্যবস্থা করো।

আরে, ব্যবসাটা জমুক, তরে আমি...।

হেরপরেও কী রকম য্যান লাগে, এক্কেবারে আরেক ব্যাটার চক্ষের সামনে।

চক্ষের সামনে ম্যানে, তুই তো জানসই ব্যাটা অন্ধ।

এইরকম আলাপচারিতার মধ্যে রাখাল অনুভব করত, ঘেন্না আর হুহু রাগে তার অন্তরাত্মায় আগুন ধরে যাচ্ছে। একদিন তো গনগনে রাগে ফেটেই পড়েছিল, এইটা আমার জায়গা, আমার দখল আগে, তুমি অন্য পথ দেহো।

আরে ভালোই দেহি জবান ফুটতাছে। মতলব খিকখিক হাসে, আমি ভালা মানুষ দেইখ্যা, অন্য কেউ হইলে ঘুমের মইধ্যে বস্তায় ভইরা এমুন দূরে ফালায়া আইত।

এইবার রাখালের রহস্যময় হাসিতে মতলব ঠান্ডা চোখে তার দিকে তাকায়, হাসো যে ?

বিলাই চিনো ? এই এলাকার বেবাক কিছুর গন্ধ আমি চিনি। গনগনে রাগকে থিতিয়ে নামিয়ে ধীর কণ্ঠে রাখাল বলে, আমি ঠিকই বিলাইয়ের মতো দশ দুনিয়া ঘুইরা আমার জায়গায় আসুম। বলেই অতল ঘুমে তলিয়ে যেতে যেতে বলে—

চান্দের রঙ হলুদ আছিল
মায়ের ঘেরান সবুজ আছিল
ভাতের রঙ মধুর আছিল
জোসনার রঙ শাদা আছিল...।

ভোর হয়।

সমস্ত শরীরের যাতনার ভাঁজে ভাঁজে সূর্য কিরণ ছড়াতে থাকলে নিশ্চল পড়ে থেকে থেকে যখনই সে ভাবে বিড়াল পায়ে হেঁটে খুঁজে সে তার আস্তানায় যাবে, তখনই এক হিমভয় তাকে আড়ষ্ট করে তোলে তাকে। তার এতদিনের চেনা জায়গায় কোত্থেকে এলো সাপ ? তবে কি এ্যাদ্দিন গাছের কোটায় ঘাপটি মেরেছিল ? সাপকে রাখালের ভীষণ ভয়। তবে কি মতলবও সেই সাপের ভয়েই ভাগা মেরেছে ?

বহু কষ্টে উঠে দাঁড়ায় রাখাল।

এরপর ফের জীবনে উল্টি সাঁতার চিৎসাঁতার করে শরীরের ক্ষত দেখিয়ে দেখিয়ে ভিক্ষে করতে করতে এক জায়গায় এসে তার কান থেকে সর্বইন্দ্রিয় সতর্ক হয়ে ওঠে।

এই তো তার বটগাছের নিচের স্থান, তার নিজ এলাকার আবাসস্থল। মতলব মিয়া তার টিয়া পাখির পসরা সাজিয়ে বসে দিব্যি হাঁকডাক করে যাচ্ছে। এর মাঝে এক ছোট কিশোরী পথ দিয়ে যাচ্ছিল তার মামার আঙুল ধরে।

আচমকা কিশোরীর উড়ন্ত পা রুদ্ধ হয়, মামা, দেখো কী সুন্দর পাখি! ওমা! এ দেখছি উড়ে যায় না। মামা টিয়াপাখি কাগজ খায় বুঝি ?

মামা কিশোরীর মাথায় সস্নেহে আঙুল বুলিয়ে বলে, না মা, এইসব টিয়ে মানুষের ভাগ্য পরীক্ষা করে।

ভাগ্য পরীক্ষা করে মানে ?

এ তুমি বুঝবে না। আরেকটু বড় হও।

বুঝব তুমি বুঝিয়ে বলো প্লিজ।

তখনই মতলব মিয়ার কুতকুতে সতর্ক চোখ সামনে বিস্তারিত হয়, এই খুকি, তুমি কোন ক্লাসে পড়ো ?

কিশোরী বেণি নাড়িয়ে বলে, আমি ? ক্লাস সিক্সে।

মতলব মিয়া তার বান্দর মুখের হাসিটার মধ্যে যথাসাধ্য মাখন মাখন ভাব এনে বলে, তুমি বুঝি কেলাসে ফাস্ট হও ?

কিশোরীর মুখে আঁধার জমে।

মতলব মিয়ার টিয়া পাখি তখন তার কাজে লিপ্ত হয়ে পড়ে, সে টিং টিং পায়ে হেঁটে একটি কাগজ ঠোঁট দিয়ে তুলে কিশোরীর সামনে গেলে রোমাঞ্চিত কিশোরীর সে-কী উত্তেজনা... মামা! মামা, টিয়া আমার জন্য কাগজ তুলেছে, দেখি ?

মামা হাল ছাড়া কণ্ঠে বলে, তোকে নিয়ে আর পারলাম না, ঠিক আছে দেখ... ।

কম্পিত হাতে কাগজের ভাঁজ খুলে কিশোরী পড়ে,

'ধৈর্য আর মন স্থির থাকিলে এই দেশের প্রধানমন্ত্রী হইতেও কেউ ঠেকাইতে পারিবে না', উত্তেজিত কিশোরীর চোখে ভাসে একদিন যানজটে দাঁড়িয়ে থাকা তাঁদের রিকশা, ভি আই পি রোডে পুলিশদের দৌড়াদৌড়ি... বাঁশির পিক পিক ফুঁ... এই রোড দিয়ে প্রধানমন্ত্রী যাবেন। কিশোরী ধেই ধেই নাচে, মামা মামা দেখো, টিয়া পাখি আমার ভাগ্যে কী তুলেছে।

মামা গম্ভীর হয়ে পকেট হাতড়ায়, অনেক হয়েছে, এখন বাড়ি চলো।

স্থবির হয়ে পড়ে রাখালের পা। এই জগতে মানুষ এত খারাপ হতে পারে ? সাপে ধরা রাখালকে মোটেই খুঁজতে না গিয়ে তার আখড়ায় দিব্বি ব্যবসা পেতে বসেছে মতলব ? কিছুক্ষণ নিঃসাড় থেকে স্থিত হওয়ার পর রাখাল ফের অন্য অনুভবে পড়ে একা একা হাসে— আরে জীবনে এর চাইতে টাউটামি জ্বলন পুড়ন কম দেখেছে সে ? মতলবের এই ব্যবহার ওসব অভিজ্ঞতার মধ্যে এমন কী বড়, সে কেন বিস্ময় বোধ করছে ? সেই অভিজ্ঞতার প্রভাবেই বরং মতলবকে হতবাক করে দিয়ে তার কাছাকাছি বসে সে... গায়, 'বেঁধেছি এমনই ঘর... শূন্যের ওপর পোচতা করে... ।'

আহা... শৈশবে দুখী বাউল যখন বাঁশি শেখাত, কী কলজে ছেঁড়া দরদ দিয়েই না গাইত লালনের গান! সেই গান জোসনা রাতভর শোনে ? পৃথিবীতে এত গান, এত সুর ? সব বাদ দিয়ে রাখাল যে গানে বাস করে সেই গানেই জোসনার বাস ? জীবনের এ কোন অদ্ভুত যোগসূত্র ? কেন সে জোসনার জীবন থেকে পালাল ? না, মাঝেমধ্যে সে ডাক্তার পরিমলের কণ্ঠ শুনেছে, কাজ করতে করতে জোসনার প্রতি পরিমল তার আকুতি লুকাতে পারে নি। সেই পরিমল জোসনার প্রতি আরো মুগ্ধ হয়েছিল, রাখালের প্রতি জোসনার কেয়ারিং দেখে। রাস্তার একজন ভিখিরিকে নিজের প্রতিদ্বন্দ্বী ভাবার ন্যূনতম ভাবনা তার মধ্যে জাগে নি। জোসনা কি রাখালকে করুণা করেছিল ? ভাগ্যিস সে বাঁশি শোনাতে চায় নি, নয়, জোসনা তাকে ঠিকই একটি বাঁশি ভিক্ষা দিত। লালনের গান শুনিয়ে সে জোসনার মন ভেজাতে চায় নি। সে ভিখিরি হয়েছে তো কী ? নিজের এইটুকু ব্যক্তিত্বকে বিক্রি না করার আল্লাদে নিজের মনে মনেই মজতে থাকে।

আরে তুমি ? মতলব মিয়া ততক্ষণে নিজেকে খাড়া করে নিয়েছে। কালকে সাপের হাত থাইক্যা তোমারে বাঁচাইলাম ? আর হারাদিন কী খুজাটাই না খুঁজছি, মাইনসে ঠিকই কয়, আক্কা মানুষ ভালা হয় না। আইস্যা কই ভালো-মন্দ পুছবা, না এক্কেবারে লাফ দিয়া নিজের ধান্দায় বইসা গেছো।

টং... পাঁচ টাকার কয়েন পড়ে ভিখিরির থালিতে, মতলব তার আগের স্বভাবে হাত বাড়াতে নিলেই তার পাঠশালার মতো টিং টিংয়ে হাতকে মচকে দিয়ে রাখাল নিজের নিমগ্নেই বলতে থাকে, কিশোরীর ফ্রক গোলাপি আছিল, ওর বোদাই মামার গেঞ্জি হলুদ আছিল, মতলববাজের রঙে ভেজাল আছিল।

কিছুক্ষণ হতবাক হয়ে রাখালের দিকে তাকিয়ে রীতিমতো রাখাল হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে এসে ঠায় চোখে তাকায়, তুমি ক্যাডা ? সত্যিই আন্ধা না, ভঙ্গি ধইরা থাকো ?

হেইটা হাসপাতালের লোকেরেই জিগান... রাখাল নির্লিপ্ত... বেশি বাড়লে খালি তো হাত মচকাইছি... এক্কেবারে ঠ্যাং ভাইঙা গাছের লগে লটকায়া দিমু।

হিতাহিত জ্ঞানশূন্য মতলববাজ আচমকা এরকম রূপ দেখে, ভয়ে ভয়ে চুপ মেরে যায়।

ইতোমধ্যে অনেক দিন চলে গেছে। মতলব তক্কে তক্কে রাখালকে লক্ষ করে দেখে, এই রঙবাজ ভিখিরির জীবনের কোনো ধান্দা নেই। মাটির ওপর ভর নিজের অন্ধত্বকে চেপে বসে রোজগার করে, হাতড়ে হাতড়ে নিপুণ দক্ষতায় তা রান্না করে খায়, আর রঙের গল্প করে। অবশ্য আজকাল নতুন পরিবর্তন হয়েছে, সেই হাসপাতাল থেকে ফেরার পর, লালন গীতি গাইতে গাইতে রাখাল ফিসফিস কাঁদে আর জোসনা জোসনা বন্দেগি করে। কিন্তু অন্ধ মানুষ, রঙ দেখতে পারে ? যেন নতুন করে এই ব্যাপারে সচেতন হয়। ফের হঠাৎ তার সন্দেহ ঘনীভূত হয়।

রাখালকে নিকটবর্তী করতে সে খুব মায়া মায়া কণ্ঠে নিজের টুপির রঙের কথা জিজ্ঞেস করে।

রাখাল বলে হলুদ।

এরপর প্যান্ট, শার্ট আরো অনেক কিছু— এইবার সত্যিই তাজ্জব মতলব মিয়া ভিখিরিকে জিজ্ঞেস করে, আপনেরে মারইপিট কইরা এক্কেবারে ভাঙ্গাচুইড়া মানুষ হাসপাতালে পাঠাইলো। কয়েকদিন থাইক্যাই এক্কেবারে প্রেমিকোর আদর পাইয়া সিদা খাড়ায়া পড়লেন। কাল দৌড়ানির ঝাপটে যারা শইল্যের ছিড়া বিড়া রক্ত একদিনেই শুকায়া মানে দিব্যি ফিটফাট হইয়া আছেন। আপনি কি কোনো ঋষি, না পীর ?

মতলব মিয়ার বিস্ময়জনিত 'আপনি' সম্বোধনে কিছুক্ষণ স্তব্ধ থেকে রাখাল বলে, আমি মানুষ।

এইভাবে দিনগুলি রাতগুলি যাচ্ছিল। একদিন কী এক খবর পেয়ে মতলব মিয়া দু'এক রাতের জন্য শহরের বাইরে গেলে একাকী শয্যায় যখন জোসনার মায়াবী অথবা শরীরী গনগনে... অথবা... বিচ্ছেদের স্পর্শ... অনুভব করে, নিজেকে এফোড় ওফোড় করছিল... তখন তার সমস্ত শরীর চমকে ওঠে... তার দেহের ওপর পাউডারের নিষ্প্রাণ দেহের একটি শরীর... তাকে আলুথালু আদর করতে করতে বলে, আমারে তুমি ঘিন্না করো ?

এ্যাই ! কেডা তুমি ?

আমি গো আমি... বলতে বলতে মেয়েটি বলে, আমি দেখতে এত কালা... এত খারাপ... কেউ আমারে পুছে না... মতলব... রাইতে একটু জায়গা দেয় বইল্যা বিনা পয়সায় আপোস করি... আর আহা... তুমার শরীলে তাগদ মরদ, কত গান ভালা তুমি গাও...।

রাখালের শরীর ওর উত্তাপে গনগনে থাকলেও হঠাৎ নিজেকে খুঁজে পায়, আপনি কী চান আমার কাছে ?

মন।

তাইলে শইল্যে উঠছেন ক্যান ?

নারীরা বেশি অবলা, অভাবে পড়লে নিজের শইল বেচে... শইল তহন জাগে না, ঠিক আছে, খারাপ লাগলে ধাক্কা দিয়া ফালায়া দেন আমারে...।

রাখালের নিভু নিভু মন জাগ্রত হয়, অস্ফুটে জিজ্ঞেস করে, আপনের কোনো পরিবার নাই ?

না।

মাইনসের বাড়িতে কাম কইরা খাইতে পারেন না ?

আমার শরীর একটু ভারী... বাপ মা কবে মইরা গেছে... স্বামীগোরে নিয়া টেনশনে থাইক্যা কোনো বিবিসাইব আমারে কামে রাখতে চায় না।

রাখাল একবার উত্তেজিত... আরেকবার ভয়ে মায়ায় শান্ত হতে হতে বলে, আপনের নাম কী ?

তখন রাখালের কানে ঠোঁট দিয়ে নিজের শরীর ধাবিত করতে করতে সে বলে— আহা... কী সুন্দর আমারে 'আপনি' কইরা ডাইক্যা দেহমনে ইজ্জতের আরাম দিতাছেন আহা।

হেই... মরণ মরণ অধঃপাতে তলাতে তলাতে রাখাল বলে, আপনে কে ? এরপর মেয়েটির মায়াবী স্পর্শে কাঁপতে কাঁপতে বলে, নাম কী আপনার ?

জোসনা।

জীবনটার মাঝে ফের উল্টি পাল্টি লেগে যায় রাখালের। এই মেয়ের নামও জোসনা ? ইতোমধ্যে রাতভর কথা হয়েছে, দুজনের গনগনে উত্তাপে শরীর স্পর্শ হওয়ার পর জোসনা বলে পরিচয় দেয়া শেফালী বলে, আরে, আমাগো দেশে অনেক নামিদামি মাইয়াও কোটি টাকার পুরুষের কী জানি নাম ? ভুইল্যা গেছি... না, মনে পড়ছে 'রক্ষিতা' তাই হইয়া থাকে... আর তুমি যেভাবে কাউরে তোয়াক্কা না দিয়া চলো, তোমার ব্যাপারস্যাপারই আলাদা, এরপর কুনদিন তুমার শইল চাইমু না... শইলে আমার ঘিন্না ধইরা গেছে।

রাখালের মাথা বোঁ বোঁ করে, সত্যিই তুমার নাম জোসনা ?

আরে সত্যি, তিন সত্যি, ক্যান আপনের পছন্দ না ?

না... না... রাখাল বিহ্বল বোধ করে

আমার এক সন্তান আর স্বামী বানে ভাইস্যা গেছে। আমি পেট ভরাইতে শরীল বেচতাম... বেচি...। হুহু কান্নায় ভেসে যেতে থাকে এই নতুন পরিচয়ের জোসনা।

রাখাল তার দীর্ঘ জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে বলে, তুমি মতলবরে ছাইরো না।

ক্যান ? আমি ওরে আর আমার শরীল দিমু না।

খামকা চেতায়ো না তারে... নতুন জোসনাকে আদর স্পর্শ করতে করতে তার চোখের জল মুছতে মুছতে রাখাল বলে— এই ধান্দাবাজ দুনিয়ায় একটু ভাবনা চিন্তা, চালাকি কইরা চল। তুমি আমারে বেশি পাত্তা দিলে মতলব আমারে খুন কইরা ফালাইব।

তুমারে খুন ? নতুন জোসনার হাসিতে ভূমণ্ডল কম্পিত হয়, তুমি জানো হাত পাও চোখওয়ালা মতলব তুমারে কেমন ডরায়, জোসনাকে সন্তর্পণে সরাতে সরাতে ভীষণ বিষণ্ন কণ্ঠে রাখাল বলে— তারপরেও আমারে নিয়া আর এক পা-ও আগাইয়ো না। বুদ্ধি দেই তুমারে, তার আগে তুমি মতলবরে হাতে রাইখা যদি সৎ থাকো মনে, আস্তে আস্তে মতলব-এর কাছ থাইক্যা সইরা আসো— আমার কথা রাখবা ?

ঠিক আছে, রাখুম। আমরা এখন 'তুমি' 'তুমি' হইয়া গেছি না ? আর তুমিই এই জীবনে পয়লা কেউ যে জীবনে আমার দুঃখ বুঝলা।

আশ্চর্য মেয়েটি বেশ্যা কিন্তু তার স্পর্শে জোসনার স্পর্শের মতো মায়া, নামও জোসনা

গভীর অতলে তলাতে থাকে রাখাল, এরপর শরীরে প্রচণ্ড হালকা অনুভব করে— জোসনা নামে যে তার শরীরের ওপর ছিল— সে চলে গেছে।

এরপর থেকে রাখাল দ্বন্দ্বে পড়ে যায়। এসব কী ঘটছে তার জীবনে ?

এর মাঝে যদিও মিটিমিটি হেঁটে একাকী মতলব মিয়া আসে... জিজ্ঞেস করে, আমি আপনাকে হাসপাতালে আপনার চক্ষু দেখাইমু— আরে সরকারি হাসপাতাল— দেখি না— কী করন যায় ?

রাখাল মনে মনে হাসে... ঘ্রাণে টের পায় ওর জোসনা নামের প্রেমিকা... সে চলে গেছে... এখন মতলব, আল্লা জানে কোন 'মতলবে' ফের, রাখালের অন্ধ চোখকে অবিশ্বাস করছে... নিজের ভেতর সততা থেকে বলে রাখাল, সরকারি হাসপাতালেও তো অনেক ট্যাকা লাগে। আমি দিন আনি দিন খাই— আমার এত খরচ দিবে ক্যাডা ?

আরে আপনের জোসনার হাসপাতাল... আপনার হাড্ডিগুড্ডি ওরাই তো ঠিক কইরা দিছে। আরে ? একটু ওই হাসপাতালে গিয়া আরেকবার আপনের চক্ষু ঠিক কি না দেহি ?

নার্স জোসনা... রাখালের সমস্ত অন্তরাত্মায় বাঁশি যখনই এই রকমই বেজে ওঠে...

আর তখনই মহা গভীর রাত্তিরে জোসনাকে ফোন দেয় পরিমল... তোমার এত অহংকার কিসের ? কেন আমার কষ্টকে রোজ তুমি তাচ্ছিল্য করো ?

জোসনার কণ্ঠ কঠিন হয়, আপনার আমার ধর্ম ভিন্ন... আপনার জীবন বাস্তবতার সাথে আমার জীবনের আকাশ-জমিন ফারাক, আমাকে মাফ করুন— জীবনযুদ্ধে আমার যা অবস্থা, জীবনেও আপনি বুঝবেন না। দয়া করে আপনার জন্য যেন আমার এই হাসপাতালের কাজটা না যায়...।

এসব তুমি কী বলছো জোসনা ? আমি তোমাকে কতবার বলেছি, আমাদের মধ্যে 'ধর্মকে' আমি দেয়ালে হাত দেবো না ? আর দুজনের মন এক হলে এসব ফারাক কোনো ব্যাপারই না।

এসব আপনার অন্ধ মোহ বলছে। আমি আপনার মতো আয়েশের জীবনকে দেখি নি। রক্তে রক্তে যে জীবনকে দেখেছি, সেটাই আমাকে জানাচ্ছে, এই সম্পর্ক সত্যি সত্যি এগোলে পরিণতি কত ভয়ঙ্কর হবে। একটু ঠান্ডা মাথায় ভাবুন... প্লিজ...।

বলতে বলতে জোসনা যখন মাথা চেপে বসে আছে।

এদিকে মতলব তখন পটিয়েই যাচ্ছে রাখালকে— উত্তরে রাখাল বলে, আবার আপনি ক্যান আমার পিছনে উইঠ্যা পইড়া লাগছেন ?

মতলব পিটপিট চোখ বাড়ায়া বলে, চাপাবাজিতে ওস্তাদ লোক আমি, ট্রেনিংপ্রাপ্ত। পুলিশের প্যাদানি খাইছি কতবার, পাবলিকের ঠ্যাঙ্গানি খাইছি কতশত স্ট্যাইলে, চেয়ারম্যানের চামচাগিরি কইরা চাপাবাজির রাজনীতি শিখছি। কেমনে ল্যাং মারতে হয়, ফাউল কইরাও গোল করতে হয়— প্রতিপক্ষরে ঘায়েল করতে হয়, সব মন্ত্র আমার জানা।

সালাম দেই, অনেক অভিজ্ঞতা আপনার।

নিজের ভাগ্যে বাঁশ দিয়া, কাকতাড়ুয়ার মতো বইসা বইসা মানুষের ভাগ্য নিয়া খেলা করি...

বাহ! ভালো, খুব ভালো।

ভালোর খেতাপুড়ি, নির্ঝঞ্ঝাট থাকবার চাই...। কিন্তু বহুত হইছে আর ঝুট-ঝামেলা সহ্য করব না, এই আমি বইলা দিলাম— হ্যাঁ।

কিন্তু মতলবের নানারকম বিবর্তন ব্যবহারের লেজমুণ্ডু নিয়ে ভাবতে বরাবরই মহাবিরক্ত রাখাল এখন তার যে-কোনো কথা বা প্যাঁচালের ব্যাপারে রীতিমতো 'বধির' থাকে। বরং রাখাল জোসনাকে ভাবতে ভাবতে নিজেই অবাক... কী করে কাল রাত মতলবের বেশ্যা জোসনা নাম নিয়ে তার ওপর উপনীত হলো? স্রেফ শুধু 'জোসনা' নামের এক মহাজাদুর ধ্বনিতে রাখালইবা কী করে এক নোংরা জলের স্রোতের মধ্যে ডুবজল দিয়ে গেল?

নিজের শরীরকে অস্তিত্ব সত্তাকে সে ধিক্কার দেয়... থুথু দেয়—

চাঁদের রঙ হলুদ আছিল।

জোসনার রঙ শাদা আছিল।

কী? ঠাটা মাইরা আছো যে? আমার কতা কানে যায় না— এইবার, মতলবের চেঁচানো কণ্ঠে রীতিমতো কেঁপে ওঠে রাখাল, স্থির কণ্ঠে বলে, ও মতলব তাই তুমি কী চাও আমি চইল্যা যাই?

মতলব তখন তার সহজাত স্বভাবে 'তুই তুকারী'তে নেমে আসে। খেপে বলে, আর গেছোস ব্যাটা, তুই গেলে আমারে জ্বালাইব কেডা?

রাখাল বলে, খুব ছোটবেলায়, এখনো মনে আছে আমার। বিভিন্ন রঙের ওপর আমার আছিল দুর্মর কৌতূহল। গাছের পাতাটি সবুজ না হয়া যদি নীল হইত, কেমুন হইত?

মতলব বলে, ঘুড়ার আন্ডা হইত।

রাখাল যেন কথাটি শুনতে পায় নি। সে তার মতো চলে চলে, কিংবা আসমান যদি থাকত সারাক্ষণ বেগুনি! তেমনি এখন মনে হইতেছে, আমার প্রতি যদি তোমার রাগ না থাইক্যা থাকত যদি ভালোবাসা; তার রঙ কেমুন হইত?

মতলব ভয় পাওয়ার ভান করে বলে, ভালোই হইত। আর তুমি যদি রাখাল না হইয়া মতলব হইতা, কেমুন হইতো?

হাসে রাখাল, ভালাই হইত। ভিক্ষা করতাম না ... টিয়া পাখির ব্যবসা করতাম।

ওরে সর্বনাশ! এ তো দেখতাছি মহা চাপাবাজ, রংবাজ এ্যাঁ! আমার তো মনে হইতেছে আমার নাম মতলব না হইয়া তোর হইলে কেমন হইত ?

এর মাঝে ফের জোসনা উড়ে উড়ে এসে রাখালের পাশে এসে বসে পরম মমতায় রাখালের চুলে হাত রাখে, এই মহাজগতের টাউট চক্করে পইড়া হাঁপায়া উঠতাছো, না লালন ?

হ্যাঁ গো হ্যাঁ... অস্ফুটে বলে রাখাল একটি দীর্ঘশ্বাস চেপে গুনগুন গায়, 'সে আর লালন এক ঘাটে রয়, তবু লক্ষ যোজন ফাঁক রে... ।'

এরপর রাখাল যেন দেখে, এক পাশে একটি মাটির হাঁড়িতে ভাত ফুটছে, ধোঁয়া উড়ছে। বাঁধানো বটগাছে হেলান দিয়ে অনুভব করে মেরুদণ্ডে প্রচণ্ড ব্যথা। তার মুখ কুঁচকে ওঠে।

জোসনা বলে, ভাত ফুটে গেছে তো ?

রাখাল অভিভূত বিস্ময়ে বলে, থাক। ফুটতে ফুটতে পানি হয়ে যাক। তারপর ফুরুত গিইল্যা ফালামু।

আমার তো মনে হচ্ছে তাও পারবে না। ইসরে! রাত্তিরের তাড়ায় সাপটা তুমারে কতই না ইট পাথর ঝোপ কাটার আঘাত খাওয়াইলো। তোমার সমস্ত শরীর ব্যথা হয়ে আছে। মুখটাও।

এই হয়তো জীবনে এত মারপিট খাইলাম... ভাবছিলাম সহ্য হয়া গেছে কিন্তু এ-কী! কেমনে কেমনে নিজ দায়িত্ব রক্তগুলান শুকায়া গেলেও শইল্যে এত বেদন ক্যান ? কী জানি! বয়স বাড়তে থাকলে ব্যথা গুলান ফিইরা ফিইরা আসে হয়তো।

জোসনার চোখ জলার্দ্র হয়। আলুথালু বাতাসে তার চুল উড়তে থাকলে সে অস্ফুট কণ্ঠে বলে, তোমার গানের কণ্ঠে এত মায়া কেন ?

কী জানি! কিন্তু তোমার হাতের মাথায় এত জাদু ক্যান তুমি জানো ?

জানব না কেন ? আমি তো সারাক্ষণ তুমার সঙ্গেই থাকি। তোমার কল্পনায় হাঁটি, তুমার কল্পনায় কথা বলি— তুমি অনুভব করো না ?

করি গো করি... তুমি আমার পিঠে একটু হাত রাখ। বেবাক ব্যথা উইড়া যাইব, জোসনা মৃদু হাত রাখলে রাখাল গায়— আমি লালন লাল পড়া পাখি আমার বেয়ারা ও তার সবুর কিছু নাই ... ।

ধীরে ধীরে রাখালের তন্দ্রা জগৎ থেকে জোসনা ফের হারিয়ে যায়। রাখাল যখন চেতনে ফেরে তখনই তার ধ্যানস্তুতার সামনে চিল্লাতে চিল্লাতে মতলব কখন যে ক্লান্ত হয়ে তার পাশে ঘুমিয়ে পড়েছে। রাখাল খেয়ালই করতে পারে নি।

সকালে বটগাছের দিকে এগিয়ে আসে মতলব। মাথায় লাল টুপি, বিচিত্র বর্ণের জামা। মনে মনে বলে— আইজকা ওরে এলাকা ছাড়া করমু, শালা। ঘাপটিবাজ।

একদিন আমি এলাকা ছাড়া হইছি আর আমার দেহ সঙ্গিনীরে পটায়া ফালাইছে। এইখানে শেফালী আর আহে না। ওর কাছে গেলেও মাইয়ার মুখে খালি রাখালের গপ্পো, রাখালের গান। কিন্তু টিয়া কাস্টমাররা তাকে ঘিরে ধরলে সে মুহূর্তে মত বদলে নিজের ব্যবসার মধ্যে ঢুকে যায়।

রাত্তির এলে যখন রাখালের ডেকচিতে ডিম ফুটছে আচমকা আবারও দেবদূত হয়ে নেমে আসে জোসনা।

জানো তুমি যে অন্ধ, কেউ বিশ্বাস না করলেও তোমারে প্রথমে দেইখাই আমি করেছিলাম কিন্তু—

রাখালের চোখ-মুখ অপূর্ব আলোয় মুহ্যমান, আমি জানি গো জানি।

আর কী জানো রাখাল ?

মুহূর্তে রাখালের সামনে মূর্ত হয় পরিমলের ছায়া। সে প্রসঙ্গ ঘুরিয়ে বিড়বিড় করে, শৈশব খুব ভালো আছিল, মায়ের রঙ কালো আছিল... তুমি যাও জোসনা যাও... রঙের মিষ্টি লোভের হাতছানিতে জাইক্যা আমারে আর মাইরো না— জোসনা আবারো ছায়ার মধ্যে মিলিয়ে যেতে থাকলে রাখাল কঁকিয়ে ওঠে। মা, মা, ও মা, সমস্ত শরীরে ব্যথা গো মা—

কেন আমার জীবনে জোসনা আইল ? রাইত দিন আমি ওরে নিয়া কী আজব খোয়াবের চক্করে পড়লাম মা ? তুমি কই ? কই মা ? তার চোখ বেয়ে গড়িয়ে পড়ে অজস্র জল। ব্যথামাখা কণ্ঠে বলতে থাকে— মায়ের রঙ কালো আছিল, চাঁন্দের রঙ হলুদ আছিল, ভাতের রঙ...

মতলব সামনে এসে দাঁড়িয়ে সহসা কিঞ্চিৎ ভয় পায়, মাথা ঘুরিয়ে চারপাশ দেখে ঝাঁঝালো কণ্ঠে বলে, ওই মিয়া একলা একলা কার লগে কথা কও ?

কী সুন্দর লাল টুপি পরছো। ভালা মানাইছে তুমারে, রাখালের এই কথায় চমকে উঠে মতলব, দৌড়ে কাছে চলে আসে।

সত্যিই তোমারে খুব সুন্দর লাগতাছে। কী সুন্দর বিচিত্তর রঙের শার্ট পরনে। আচমকা ভয়ে এবার মিটকি লেগে যাবার মতো অবস্থা হয় মতলবের।

না... ব্যাটা ধান্দাবাজ! নির্ঘাত চোক্ষে দেহে। কিন্তু, অন্ধ না হলে রাখালের মধ্যে আত্মবিশ্বাস এত দৃঢ় কেন ?

বৃক্ষ সবুজ, নক্ষত্র রুপালি, অন্ধকার কালো, কচুরিপানার ফুল বেগুনি-সুন্দর শাদার রঙের মনে হয় মা মনসার মাথার হীরার মুকুট... জোসনা যদি আমায় ছুঁতো... ওওও।

এইবার মতলব সত্যি সত্যিই সন্দেহবাজ হয়ে বলে, আমি কাইলই তোরে তোর জোসনার হাসপাতালে নিয়া গিয়া নিজের চোক্ষের সামনে চক্ষু ডাক্তার দিয়া তোর

চোখ টেস্ট করাইমু... বহুত আপনি আপনি করছি, তোর টাওটামি যদি আমি না ছুটাইছি, হালা ভঙ্গিছঙ্গি দিয়া তুই আমার মাগি শেফাইলিরে এক রাইতের মধ্যেই পটাইছস! দেখতে যত বোদাই তুই ভিতরে তা-না।

মুহূর্তে হিম হয়ে আসে রাখালের দেহ। সেইদিন তার দেহের ওপর অপূর্ব ঘ্রাণ ছড়িয়ে উপনীত শেফালী নিজের নাম জোসনা বলল কেন ? কী করে ওই মেয়ে 'জোসনা' নাম জানল ? ক্রমশ ফের অধঃপাতে তলাতে থাকে রাখাল।

রিকশা এসে দাঁড়ায় হাসপাতালের গেটের বাইরে। মতলব মিয়ার ব্যস্ততার যেন শেষ নেই। দ্রুত নেমে রিকশা ভাড়া মিটিয়ে দেয়। রাখাল তখন রিকশায় বসে অন্ধ চোখ বন্ধ করে গভীর নিশ্বাস নিতে থাকে। যেন চারদিক জোসনার সুগন্ধে মৌ মৌ করছে। এটা দেখে রেগে গিয়ে মতলব বলে, বাহ্-বা দেইখা মনে হইতেছে, যেন রাজ সিংহাসনে বইসা আছোস বেটা। ওই, রিকশায় কোনোদিন চড়স নাই ?

যেন ঘোরের মধ্যে কাব্য আউরায় রাখাল—

পরিচিত মুখ, পরিচিত ঘ্রাণ... মনে হইল, তাইতো একটু যাচাইবাছাই করি, স্বপ্নে না বাস্তবে আছি।

এমন সব কথাবার্তা বন্ধ কর। আমার এন্টিনার সাড়ে চাইর হাত উপর দিয়া যায়। কী কস এইসব, যাইক, নাম বেটা এইবার! ক্যামনে ধরা খাস দেহি। রঙের খেলার বারোটা বাজাইমু।

অস্ফুটে হাসে রাখাল! বলে, ক্যান বৃথা দৌড়-ঝাঁপ তোমার মতলব ভাই ?

ক্যান, ভয় পাস নাকি ?

কিসের ভয় ?

সত্য যদি ফকফকা হইয়া যায়। ধরা খাস।

কিসে ধরা খাব ? আমি তো জোসনালোকে আইসা ডুবজল খাইতাছি।

অ্যাকটিং করিস না, চল— হাসপাতালের ভিতরে চল। আগে ডাক্তার তো দেখাই। তোর লগে তোর জোসনাও ধরা খাইব। আমার লগে চালাকি।

হাসপাতালের প্যাসেজে পা থমকায় রাখালের।

কিরে— আবার ব্রেক মারলি ক্যান ?

পরিচিত মুখ, পরিচিত ঘ্রাণ ধরা দেয়, ছোঁয়া যায় না। এ কিসের লুকোচুরির খেলা ? একি মিথ্যা না সত্য ?

এই ব্যাটা চাপাবাজি কইরা ধাপ্পাবাজি করিস না, আগেই কইছি, চাপাবাজির ট্রেনিংপ্রাপ্ত আমি। ধাপ্পাবাজির উস্তাদ কইলাম আমি।

চাপাবাজি না সত্যি, ধাপ্পাবাজি না, এইসব বুঝি না আমি... তয় তারে ধরা যাইব না ছোঁয়া যাইব না।

যাইবো, আজ তরে হাতে হাতে ধরা যাইবো।

বাইরে শাদা ভিতরে শাদা, কষ্ট কখনো তার শাদা কালা কাদা দিয়া লেপটে দিবার পারবে না কেউ। বড় শক্ত মনের মানুষ সে।

হাসপাতালের মইধ্যে কার কথা কস, বাতাসের মধ্যে ?

ভালো মানুষের পরিচিত মুখ, পরিচিত ঘ্রাণ। আমার চেনাজানা হারাজীবনের... আহা পরী... শাদা আঁচল জড়াইয়া।

রাখালের সমস্ত দেহমনে ঘোর রোমাঞ্চ— সত্যিই কি দেখা হবে জোসনার সাথে ?

যে সদা বসত করে,

অন্তরের অন্তস্থলে। চলতে ফিরতে মাঝেমইধ্যে পাশ কেটে যায় রাস্তার মধ্যে। উড়াল দেয় মাথার ওপর দিয়ে। কী যে সুখ— কী যে আনন্দ হয় আমার—

শেফালীকে হারিয়ে ভেতর ঝাঁঝে মতলব ডাক দেয়— কীরে ? বুঁদ মাইরা গেলি যে ? ফের মনে মনে তখন বলে, শালা কি পাগল, না ধরিবাজ! ধরতে পারতেছি না ক্যা ? এরপর বলে, খাড়াইয়া খাড়াইয়া তামাশা করবি, না চোখটা পরীক্ষা করাইবি ?

ঘোর অতল থেকে উঠে দাঁড়ায় রাখাল, বলে চলো— তোমার যখন এতই ইচ্ছা। তাও যদি শান্তি হয় তুমার।

এরপর সোজা চক্ষু ডাক্তারের কাছে যায় মতলব। ঠায় চোখে দেখে, ডাক্তার রাখালের চোখ পরীক্ষা করছে কম্পিউটারের সাহায্যে। চুপচাপ লেন্সে তাকিয়ে আছে, মুখটি ঢুকিয়ে রাখাল।

ইতোমধ্যে যেন উড়াল ঘ্রাণের গন্ধ পেয়ে জোসনা এসে আছড়ে পড়ে রাখালের সামনে, তুমি এইখানে ? তখন লেন্সের সামনেও আত্মনিমগ্ন রাখাল এই জোসনা আর রাত্তিরের জোসনা নামে পরিচয় দেয়া শেফালীকে একাকার করে নিজের দেহমনে এক মিশ্র হাবুডুবুর মাঝে পড়ে যায়। একাকার করে হাবুডুবু খেতে থাকে। জাতে মতলব যেহেতু... সে তার ধান্দায় এগোয়... মিষ্টি মিষ্টি করে জিজ্ঞেস করে... মানে, ম্যাডাম, উনি এত রঙ দেখতে পান... মাইনে... মানুষেরা ভুল বোঝে... আসলেই উনি অন্ধ কি না ?

তক্ষুনি এসে দাঁড়ায় ডাক্তার পরিমল, হ্যাঁ... হ্যাঁ সে অন্ধ। আমাদের কাছে রিপোর্ট আছে। রাখাল মহাবিব্রত হয়ে তোতলায়, না মানে নানা মানুষ নানা সন্দেহ করে। আপনের মুখে নিশ্চিত হয়া বড় শান্তি হইলো।

অন্ধ শুনে শান্তি হওয়ার কী আছে ? চিকিৎসা করে তাকে ভালো করে তুলবে ? শোনো, আমরা ভালোভাবেই জানি। এই নিয়ে যদি আর এক ফোঁটা সন্দেহ করে রাখালের ওপর টর্চার কর, তোমাদের পুলিশে দেব।

পরিমলের এই কথায় জোসনার মনটা একটু গলিত হতে থাকলে মতলব মিয়া নতুন ধান্দার খোঁজে অভিভূত হতে থাকে।

মতলব মিয়া রাখালকে নিয়ে চলে গেলে জোসনা পরিমলের পাশে স্থবির দাঁড়িয়ে থাকে। সে তার মন-আঙুল দিয়ে স্পর্শ করে রাখালের মায়াবী চোখ। অপসৃয়মাণ সেই লোকটি তার চোখের সামনে থেকে অদৃশ্য হতেই জোসনা ভেতরে ভেতরে গভীর যন্ত্রণায় কুঁকড়ে ওঠে। মনে পড়ে নিজ শৈশবের কথা। সে দিনে ক্লাস করত, রাতের বেশির ভাগ সময় তাকে দত্তক নেয়া ভদ্রমহিলার সেবা-যত্নে ব্যস্ত থাকত।

বাবা-মা'র জন্য হুহু যন্ত্রণা চূড়ান্তে উঠতে এক দৌড়ে চলে আসত তাদের কাছে। মেয়েকে পেয়ে প্রতিবারই আকুল কান্নায় ভাসত তার বাবা-মা, তখন জোসনাও অশ্রু প্লাবনে ভাসতে ভাসতে বলত, আমি লেখাপড়া কইরা বিরাট বড় হইলে তুমাদের সিংহাসনে বসায়া রাখুম। তুমরা আর ভিক্ষা করবা না।

তখন বাবা-মা মেয়ের দু'হাত চার জলার্দ্র চোখে চেপে বিড়বিড় আশীর্বাদ করত... তুই বড় হইলেই আমাগো মনের সিংহাসন বিরাট হইব, তুইই আমাগো রাজকন্যা... মনের পরী... এরপর তিনজন গাইত এককণ্ঠে এক কোরাস—

'সময় গেলে সাধন হবে না... অমাবস্যায় পূর্ণিমা হয়...।'

এরপর একদিন সেই অন্ধ বাবা-মা, একজন আরেকজনকে জড়িয়ে ধরে রাস্তা পার হচ্ছিল... সহসা ধাবমান ট্রাকের তলায়... ওহ্ কী রক্ত... জোসনার পৃথিবীটা রক্তের নহরে ভেসে গেল... বিষাক্ত যন্ত্রণায় নীল হতে হতে কম্পিত জোসনা কষে পরিমলের হাত ধরে।

জোসনার এই ব্যবহারে পরিমল প্রথমে হতচকিত হলেও ক্রমশ নিজেকে সামলে নিয়ে স্থিত কণ্ঠে প্রশ্ন করে, কী হয়েছে জোসনা ? শরীর খারাপ ? জোসনা আলোছায়ার ঘোর চক্রে পাক খেতে থাকে, প্লিজ, আমার এই কষ্টের জীবনটার মধ্যে নিজেকে জড়িয়ে আমাকে আর কষ্ট দেবেন না। আর এক ফোঁটা কষ্ট বইবার শক্তি আমার নেই।

পরিমল এইবার বিস্মিত এখন, হঠাৎ এই কথা কেন ? আমি ঠিক বুঝতে পারছি না জোসনা।

করিডোরে ডাক্তার-নার্সদের হাঁটাহাঁটি। অস্বস্তির ফাঁপড়ে পড়ে সে সন্তর্পণে জোসনার হাত ছাড়িয়ে নেয়, আর নিজের মধ্যে আবর্তিত জোসনা বলে, না... না

কিছু না। যান আপনি প্লিজ... বলে, প্রায় ছুটতে করিজোরে এসে লম্বা নিঃশ্বাস নিতে চায়। ক্রমে ক্রমে নিজের মধ্যে স্থিত হয়ে আসতে থাকা জোসনা দেখে মতলব মিয়ার ধূর্ত চোখের পিটপিটানি... গভীর নিশ্বাস থেকে সে বলে, না, আর ঠেকানোর উপায় নেই... রাখালকে ওরা বাঁচতে দেবে না।

টিয়ার ব্যবসা লাটে উঠে মতলববাজের। সে খুবই দামি কোট, জুতা পরিয়ে রাখালকে জনসম্মুখে নিয়ে আসে। এইসব পোশাকের মধ্যে দমবন্ধ অস্বস্তিতে পড়ে রাখাল। মতলববাজ বক্তৃতা শুরু করে, ভাইসব, পথেঘাটে পড়ে থাকে কত ধুলা, কত শুকনা পাতা, এর মাঝে কোথায় পড়ে আছে মূল্যবান হীরাটি তার খোঁজ কে রাখে? আজ তার সঙ্গে পরিচয় হোক, যার আছে অলৌকিক ক্ষমতা, সে ঘেরান শুঁকে যে-কোনো কিছু স্পর্শ কইরে তার রঙ বলতে পারে।

এক দর্শক হাসে, আরে ছোঃ—এ তো দু'বছরের শিশুও পারে।

তাইরে নারে না, দেখেন— মতলব খুশির নাচ নাচে একপাক, আপনাদের অবগতির জন্য জানাচ্ছি, সে একজন অন্ধলোক। এই যে দেখেন ডাক্তারি সার্টিফিকেট।

তখন রাখাল এক গভীর যাতনার মাঝে স্বস্তিহীন উশখুশ করতে থাকে। এর মাঝেও কিছু আগে তার সামনে আসা এক ফালি বাতাসের মতো দাঁড়ানো জোসনাকে উপলব্ধি করে, তার পলকহীন চোখ অসীমের মধ্যে হাসতে থাকে। ইতোমধ্যে লোকজন কেউ উঠে এসে চোখ পরীক্ষা করতে শুরু করেছে।

একজন বলে, ধুর ওগুলো ভণ্ডামি।

সব দুই নম্বরি কাম কাইজ, বুজরুকি।

এই রকম কাণ্ড কত দেখছি।

লোকজনের এইরকম গুঞ্জরণে আরো একপাক ঘুরে মতলব বলে, এই যে, ভাইয়েরা, এই যে ভাই হুটপুটি করবেন না। সত্য-মিথ্যা যাচাইবাছাইয়ের জন্যে চ্যালেঞ্জ হইয়া যাক।

কিসের চ্যালেঞ্জ?

একজনের এই প্রশ্নে উত্তেজনায় মতলব তখন কী দিয়ে কী বলবে প্রায় এলোমেলো হয়ে যায়। সে বলে, কেউ যদি ডাক্তার আইনা প্রমাণ করতে পারে সে অন্ধ না, দশ হাজার টাকা দেব তারে, আর কেউ যদি না পারে—

কেউ যদি না পারে?

দর্শকদের এই প্রশ্নে আরো উত্তেজিত এবার মতলব, কেউ যদি ফেল মারে, ফেল মারলে তার হইয়া আমি নাকে খত দিমু একশ'বার।

এইডা আবার কেমন চ্যালেঞ্জ হইল ?

বুঝলেন না ? যাতে আপনারা মনের জোরে কাজটা করেন। ডাক্তার আনার ঝক্কি আপনারা পোয়াবেন। তার খেসারত আমিই দিমু। ও হ, আর একটা কাজ আপনারা করতে পারেন, কইষা তার চোখ বাইন্দা পরীক্ষা করেন।

এইটা একটা জুতসই কথা। লোক এমন খরা খরা দিনে আচমকা হুজ্জোতের উপকরণ পেয়ে রীতিমতো মাতোয়ারা হয়ে পড়ে। গতরাত থেকে কি না নিদ্রাহীন সময়ই না গেছে মতলব মিয়ার। রাখালের ক্ষমতাকে কী কাজে ব্যবহার করা যায় জুতসই কোনো ভাবনাই খুঁজে পাচ্ছিল না। যে ভিখিরিকে এতদিন দূরদূর করত, তাকে রীতিমতো তোয়াজ করে পকেটের সব সঞ্চয় খরচ করে কেনে দামি স্যুট, জুতা কিনে দেয়। আজ লোকজনের হুলুস্থুল দেখে তার সে-কী সুখ! একদল লোক চোখ বাঁধার কাজ করে। একজন সবুজ জামাওয়ালা এগিয়ে আসে, বলেন তো এইডা কী রঙ ?

কম্পিত হাতে ছুঁয়ে ছুঁয়ে রাখাল বলে, সবুজ।

তাজ্জব বনে যায় সবাই। কালো চাদর গায়ে একজন এগিয়ে আসে, বলেন আমার চাদরের রঙ কী ?

কালো।

হা! হা! পাইছি পাইছি... মোটাসোটা রাখালকে চিমশে মতলব জড়িয়ে উজিয়ে হাহা করে হাসতে থাকে।

কিন্তু মতলববাজের যাই হোক, এইসব টানাপড়নে রাখালের সারাজীবনে যা-ও কিছু শান্তি ছিল, তার মধ্যে সর্বনাশ ঢুকে গেল। মতলব ইতোমধ্যে রাখালকে গিনিপিগ বানিয়ে তাকে মৃত্যুর হুমকি দিয়ে রীতিমতো নিজের দাস বানিয়ে ফেলেছে। যদিও সামনে সামনে তোয়াজ করে, কিন্তু রাখালের রঙবিষয়ক ব্যবসা নিয়ে টাকা উপার্জনে দিন দিন সার্থক হতে থাকলে সে সেই টাকায় রাখালকে নিয়ে সুন্দর একটি বাড়ি ভাড়া করে। তাকে ফোমের বিছানা কিনে দেয়... সেই বিছানায় রাখাল চিৎ কাতে ঢেউ খায়, ঘুম আসে না।

মতলব রীতিমতো ঘরের মাঝে লাফালাফি করে— জইমা গেছে খেলা। কইছিলাম না হই হই কাণ্ড রই রই ব্যাপার। টেকারে টেকা; থরে-থরে টেকা।

রাখাল ঘোরের মধ্যে থাকে, কী করে দুনিয়ার রঙ শাদা হয়? বরং ঘোর কালা—

কালা... এত কালা? ক্যান?

কী রাখাল, খালি কালা দেখেন ক্যান?

তাইতো এত কাল দেইখা এসছি; বরং শৈশবে অনেক রং ছিল—

অস্থির রাখাল বলে, আমারে নিয়া কী মসকরা মারতাছস তুই? এক্কেবারে মটকা মাইরা মইরা যামু... এহন আর তুই আমার একলার হাতে নাই। আমি তো তোরে সেইভ কইরা কইরা ব্যবসা করুম। আমি মরলে দশ শকুনে তরে ছিঁইড়া যাইব। ডুগডুগি খেলব। এরপর আবার ফের ঘুরিয়ে পড়তে পড়তে নিজেকে স্থিত করে বলে, বহুত তুই তুই সহ্য করছিরে তোরে, এখন ঘুমা।

মটকা মাইরা তুমি মববা কী? আমিই মরমু— এরপর দেহি, তুমরা কে আমারে লইয়া কী করবার পারো।

ঝাঁঝিয়ে ওঠে মতলব। চুউপ। এক্কেবারে চুপ। এরপর ফের কী বুঝে রাখালকে পটাতে তার মাথায় হাত বুলিয়ে ফিসফিস করে, আরে, মরণের কথা কিসের? আমরা দুইজনই হইলাম রাস্তার গু খাওয়ার যুদ্ধের একই রকম সঙ্গী, ফারাক একটা তুমার মনটা এহনও সাফ আছে, আমার টা 'পইচ্যা' গেছে। ভালা কামাই-এর একটা সুযোগ পাইছি। এইডা কামে লাগাইয়া যদি দুইডা ভালা খাই, ভালা পড়ি খারাপটা কী?

ক্রমশ নিজ স্বভাবে আত্মনিমগ্ন রাখাল বলে গ্রামের কথা, সেই যে নদীর স্রোতস্বী জল, তারও এক ময়ূরাক্ষী রূপ ছিল। গ্রীষ্মে ঝিকিমিকি, শীতে কালো বিষণ্ন, সূর্য ডুবে

যেতে থাকলে লালচে ছোপ, ছুঁয়ে ছুঁয়ে কতদিন জলের রূপ পাল্টে দিছি। গুঁড়িয়ে দিছি। গুঁড়িয়ে দিলেই বাদামি এক রঙ ধারণ করত— নেচে নেচে সুন্দরের খেলা চলত। সৌন্দর্যের খেলা কাকে বলে !

মতলব ফের দিশেহারা বোধ করে, ঘরের আলো-আঁধারের মাঝে হামাগুড়ি দিয়ে রাখালের সামনে অবচেতন কণ্ঠে ফিসফিস প্রশ্ন রাখে, সত্যি বলেন তো, আপনে ক্যাডা ?

স্থিত হাসে রাখাল, কতবার বলবো, আমি মানুষ। এরপর ফের থেমে বিড়বিড় যেনবা পাঠ করে, কবে পৃথিবী আছিল বহু বর্ণের। তহন তো চেতনার মঞ্চে সেই পুরনো অভ্যাসের ছিন্নবিচ্ছিন্ন খেলা— পুরনো কুরশি কাটারই নানা রঙের সুতায় বোনা নকশা। মার ওমে শুয়ে কতদিন; মা-মাগো তোমার পরশ কী হলুদ আছিল গো মা, পাকা ধানের সইস্যের লাহান।

আপনার কথা শুনলে মনে হয়, আপনে এই দুনিয়া না, ভেন্ন গ্রহের মানুষ। যা হোক এই দুনিয়ার আন্ধারে যেহেতু আইসাই পড়ছেন এহন যহন একটু আলোর দিশা পাইছি, হেইডারে কামে লাগায়া সুখে বাঁচি। এরপর আর চিন্তা কী ? এই 'রঙ' আমাগো জগৎ আলোর সুখ দিবো।

রঙ আছিল আমার একলার আনন্দ। তুমি সেই আনন্দ জনে জনে বিলায়া আমারে সত্যি সত্যি নিঃস্ব কইরা দিছো।

ফকিন্নীর আবার রঙের আনন্দ, দাঁতে দাঁত চেপে গুমর তুফানে রাখালের দিকে তেড়ে উঠতে গিয়েও মতলব নিজেকে 'থামিত' করে।

বরং বলে হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেইল্যান না রাখাল ভাই। আবারো কই, আল্লার দেওয়া শক্তিরে কামে লাগায়া নিজের ভাগ্য বদলান।

হাঁসফাঁস করে অসহ্য এক বোধ থেকে তড়পায় রাখাল। এইসব অশান্তির মধ্যে আমাকে আর টানাটানি করো না ভাই মতলব।

অশান্তি ! অস্থির চিৎকারে প্রাণপণে চেপে রাখা হিংস্রতাকে আবার দাবায় মতলব চুউপ, একদম চুপ। বকবক কইরা আমার জানটারে কাবাব বানায়া... ধুর! আর একটা কতা কইলে ঘুমের মইদ্যে গলা চিইপ্যা... কাঁপতে কাঁপতে মতলব একসময় শ্রান্ত বোধ করে।

রাতে বিছানায় নিজেকে পেতে দিতে দিতে ভিজে উঠা কণ্ঠে ফিস ফিস করে রাখাল– তাই করেন ভাই।

মতলব মিয়া যখন 'পাইয়া গেছি' এই ভাবনায় উত্তেজক আলুথালু লাফঝাঁপে ব্যস্ত, শরীর বলে কথা, একসময় তার মধ্যে ক্লান্তি এসে বসলে মগজের কোষগুলোও শান্ত হয়। তখন সে অতি সন্তর্পণ চোখে দেখে, অন্ধ লোকটি কী অবাক বিস্ময়ে গ্রীল ধরে জানালায় দাঁড়িয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে।

যেন বা অকস্মাৎ হুঁশ হয় তার, না, এই ধমকধামক 'তুই তুকারী' দিয়ে আর যাই করা যায়, রাখালকে আটকে রাখা যাবে না। এর কোনো দিশার ঠিক নেই, বেশি বাড়াবাড়ি আটকালে দেখা যাবে, মতলবের চোখের সামনেই এমন উড়ালে যাবে... না... না... কোনো ভরসা নেই ওর...। রাখাল... এক হিম আশঙ্কা থেকে হামাগুড়ি দিয়ে শোনে রাখালের কণ্ঠে অন্য গান 'যদি একখান সুন্দর মুখ পাইতাম, সদরঘাটের পানসুপারি তারে বানাই খাওয়াইতাম।'

সে ভয়ে ভয়ে হাতের মধ্যে মায়া তৈরি করে হাত ধরে রাখালের... সুন্দর মুখ পাও নাই রাখাল ভাই ?

মতলব মিয়ার হঠাৎ নানারকম এহেন আচরণে হঠাৎ একটু অবাক হলেও পরক্ষণেই এই লোকটার যে-কোনো আচরণে কেন রাখাল এখনো অবাক হয়, সেটা ভেবে বিরক্ত বোধ করে।

কী রাখাল ভাই চুপ যে ?

রাখালও এই নিশ্চুপতার মধ্যে নিজের মধ্যে জমে থাকা পুঞ্জিভূত কুয়াশা সরাতে সরাতে ভেতরে ভেতরে একটি হালকা মৌজ তৈরি করে মতলববাজের এই মুহূর্ত আচরণের 'মতলব' ঠাহর করতে চায়, ফলে সেই নির্মিত বানানো মৌজ কণ্ঠেই বলে, সুন্দর মুখ ? হেঃ গান তো গানই— তয়, কী আজব মতলব ভাই, এই গান গাইতে গাইতে ক্যান জানি সদরঘাটের পানসুপারি খাইবার লাইগ্যি পরাণটা ফাইডা যাইতাছে।

মতলব এক দৌড়ে জানালায় গিয়ে বাইরে তাকিয়ে রাতের বয়স মাপতে মাপতে ঘড়ি দেখে, সাড়ে বারোটা। বলে, সদরঘাটের পানসুপারি খাইছো আগে ?

হাসে রাখাল, এই শহরের এমুন কুন চিপা গলি বড় সড়ক আছে, যেখানে আমি ফড়ফড়া বাতাসে উড়ি নাই ? পুরান ঢাকার ব্যাপার-স্যাপার আলাদা ভাই, কালি ভুনা,

কাচ্চি... পরোটা ডিম ভাজি, এইসবের গন্ধে দিনেরবেলায় কামের হুজ্জোতে ঝিম মাইরা থাকন জায়গাটা রাইতে এমুন চিক্কোর দিয়া জাইগ্যা ওঠে, যত রাত বাড়ে ততই বাত্তি, খাওন-ফুর্তি— আহারে কী মজা যে সদরঘাটের পান সুপারির।

মতলব মিয়া এখন কিছুক্ষণ ঝিম মারে।

এরপর নিজেকেই নিজের হঠাৎ বেকুব মনে হয়, এ্যাদ্দিন পর রাখাল তার সাথে একটি সহজ-স্বাভাবিক আবদার করেছে, পানসুপারি, আর মতলববাজকে বলা যায় তুচ্ছ করে এই শহরের এক্কেবারে গলি ঘুপচি উড়ালের রাজা মনে করছে, তার কাছে রাখাল এই রাতের বয়স মেপে হেরে যাবে ? এরপর রাখালের কাছে তার কোনো পাত্তা থাকবে ?

সে বলা যায় সটান ঘুরে দাঁড়ায়, চলেন ভাই।

রাখাল মতলবের এই কথায় অনেকদিন পর পরাণে বড় মধুর আরাম বোধ করে, প্রাণটা বড় হাঁসফাঁস করছিল রাত শহরে উদাস আকাশের নিচে ঘোরার জন্য কিন্তু টোপটা মতলব এত দ্রুত গিলবে, আশা করে নি।

ওরা যখন সর্পিল গলির পা কোমর মাড়িয়ে মহারাস্তার বুকে, তখন নিঃসীম স্তব্ধতায় এই শহর স্থির। কেবল দফায় দফায় এক্কেবারে কলজে মাড়িয়ে দানব দৌড়ে ছুটতে থাকা ধাবমান ট্রাকের শব্দে ধাবধাব কলজের ধড়ফড়িয়ে উঠতে থাকা ছাড়া। তাও হতো না, বেশ কিছুদিন নির্জনে কাটিয়ে অভ্যাসটা কি একটু বেশি শান্ত হয়ে গেছে? এই ভাবনার মধ্যে পড়তে না হতো রাখালকে।

মতলব তো আজ রাখালকে টক্কর দেয়ার যুদ্ধে নেমেছে, ফলে সে এত রাতে যত চিল্লাচিল্লি করে টেক্সি, সিএনজি যা পায় ততই বুকের মধ্যে আরাম বোধ হয় রাখালের।

কিন্তু... একী?

জিভে নেশায় সদরঘাটের পানসুপারি খাওয়ার আকুলতা এমন দাউদাউ করে জেগে উঠল যে? যা হোক, ভালো লাগছে এই ভেবে যে রাখাল কখনো রাস্তার পাশে বসে কখনও দাঁড়িয়ে রীতিমতো প্রার্থনা শুরু, যেন সে যত শিগগির একটি বাহন পেয়ে যায়।

আর রাখাল অপূর্ব হাওয়া রাজধানীর নির্জন পলিওশনহীন রাতে স্পষ্ট দেখতে পায় আসমানকে।

হুহু বাতাসে না আঁধার তো নয়, যেন ধবধবে পরীর ডানা মেলে জোসনা উড়ছে... কোন সেই নিদ্রাহীন মানুষের জানালা থেকে ভেসে আসছে গান... তুমসেহী... দিন হোহাতে... হাড়ঘড়ি শ্বাস আতাহে... তুম সেহী... খুরি সে বেহুশী... না... না... পড়শি যদি আমায় ছুঁতো... সারা অঙ্গে যখন সে জোসনার স্পর্শ কাঙ্ক্ষায় রাখাল রোমান্টিক, তখন টের পায়, বহুকষ্টে একটি ঠেলাগাড়ির ব্যবস্থা করার পর মাঝরাতের পথ নয়, দুজনে সেটাতে বসে মহাপৃথিবীর দিকে রওয়ানা দিয়েছে।

ফিরফিরে হাওয়া... এটা কোন ঋতু? মা'র কোমল বুকের সবুজের শৈশব ওমে নিজেকে আচমকা জীবনের প্রথম ঢুকিয়ে ভীষণ অসহায় ব্যর্থ আর কাঙাল মনে হয় রাখালের, আহারে আমার জন্মদাত্রী মা, তুমি কই আছো গো? পেটের মইধ্যে কতদিন কত রাইত রাইখ্যা জন্ম দিয়া, জন্মের পরে কী যতনইনা করছো। যে ব্যাটা তুমারে লইয়া গেছে, হেয় তুমারে কষ্ট দিবার পারে, তুমারে লাথি মাইরা ভাইগ্যা যাইতে পারে, ক্যান এইটা একবারেও ভাবি নাই? আমি একবারও ক্যান বুঝি নাই, তুমিও আমার বেদনে কষ্টে থাকতে পারো? ও... মা... মা... গো...।

যখন ঠেলাগাড়ি নিজেকে ঠেলাতে ঠেলাতে যাচ্ছে তখন রাখাল নিজের আপন প্রাণ বাঁচাতে চোখের জল মুছতে মুছতে শুনে মতলবের বকবক... ও রাখাল ভাই... পানসুপারির দোকান যে বন্ধ, কালিভুনা খাইবা ?

না।

তক্ষুনি মতলব এতক্ষণ অনেক কষ্টে লুকিয়ে রাখা স্থিত রূপের বাইরে, তার আসল রূপে ফিরে আসে, কী ? তুই আমারে তোর চাকর ভাবছস ? এত্তোকষ্টে, এতোদূর নিয়া আইলাম...।

এরপর গজগজ করতে করতে যখন দেখে রাখাল রাত আকাশ পানে নির্বিকার মুখ করে কী নিয়ে যেন নিজের মধ্যেই নিমজ্জিত হঠাৎ মতলব হাওয়া হয়।

কিন্তু রাখালের ঘ্রাণে খাবারদাবারের মধুর হাওয়া। না, পানসুপারি খেতে জিভের যে লালচ উঠেছে, তাকে থামানো কঠিন। অকস্মাৎ তার ভয় হয় প্রথম, ব্যাটা ভেগে গেল নাকি ? কিন্তু পরমুহূর্তেই আমোদ, আরে! এটাই তো রাখাল চাইছিল, মতলবের দাসবৃত্ত থেকে ভাগতে। একদম চনমনে হয়ে ওঠে তার শরীর। সে আশেপাশের ঘ্রাণ শুঁকে যেই ঠেলাগাড়ি থেকে নিঃশব্দে নেমে পালাতে যাবে, যেন আসমান ফুঁড়ে তার মাথার ওপর এসে পড়ে মতলব, কী ভাবছস তুই! তুই ভাগবার চাইলেও ঠেলাওয়ালা তরে যাইবার দিতো ? যাই হউক, একটা দোকানে ময়লা পড়া ছিঁড়া বেড়া কিছু পান, ভাঙ্গা, গুঁড়া সুপারি পাইছি, ময়লায় ভরা আছিল, ধুইয়া আনছি খাও। আরে কী তাজ্জব বাপ খাসিও না-গরুওনা-মাইঝ রাইতে সদরঘাটের পান সুপারি খাইবার লাইগ্যা কারো পরান এমুন পাগল হয় ? আ... জ... ব! বলে রাখালের মুখে জোড়াতালি দিয়ে বানানো পানসুপারির খিলি সজোরে ঠেলে দেয়।

ওরা যখন ফিরছে তখন মাঝরাত্রি গোরস্থানের মতো স্তব্ধ।

কী সুন্দর রাতের পথ।

এই পানসুপারি চিবুতেই কী সুখ। শালা মতলব, ওই ভাঙাচুরা পানসুপারির মাঝেই কী সুন্দর জর্দাচূর্ণ মাখিয়ে এনেছে। কিন্তু ঠেলাগাড়ির ধাক্কা ধোক্কায় পাছার মধ্যে একদম ব্যথা ধরে গেছে।

ওমা! এর মধ্যে কোত্থেকে হাসনাহেনার গন্ধ ভেসে আসছে? এর মাঝে মতলব ঠেলা থেকে নেমে রাত পুলিশের সাথে ঠান্ডা কথোপকথনে কী সব যেন ভজাচ্ছে, ভাসা ভাসা কানে আসে।

কিন্তু যখন নিজেকে এসব থেকে এড়িয়ে নিজের মধ্যে বুঁদ-বিন্যস্ত হচ্ছে রাখাল, তখন ফিরে আসা মতলবের কণ্ঠ তাকে ঘোরবিচ্ছিন্ন করে, হালা, এই দেশের পুলিশ, দশটা ট্যাকার লাইগ্যা কী কাইজ্যাই না করল? পরক্ষণেই সহানুভূতিশীল মতলবের কণ্ঠ সত্যিই বিস্মিত করে রাখালকে— কী করব ওরা? বিদেশে সবচাইতে বেশি দাম পুলিশের, সম্মান পুলিশের, আর আমাগোর দেশের পুলিশ? হারাজীবন কুত্তার খাটনি খাইট্টাও কাজের বুয়ার ট্যাকাও উপার্জন করবার পারে না।

এরপর ফের ধেয়ে ধেয়ে পথ চলা। কিন্তু যখনই ক্লান্তি-অবসাদে শরীর নেমে আসছে রাখালের তক্ষুনি মতলব মিয়ার 'এই ঠ্যালা থামো' এই হুমকিতে নিজেকে সে টানটান করতে চেষ্টা করে।

মতলব দেখে, হুহু রাস্তার মাঝখানে চারজন বোবা দম্পতি আ... উ... করে এমন ঝগড়ায় মেতেছে... সবাই পরস্পরকে কোমরে লুঙ্গি গেঁথে আঁচল এঁটে এমন আমূল নিশান আক্রমণে লিপ্ত... মতলব যখন ঝগড়ার বিষয় কিছুতেই খুঁজে পায় না, রাখাল অবসাদে ঝিমিয়ে পড়তে পড়তে অনেক কষ্টে অনুধাবন করতে পারে বোবাদের যুদ্ধের কারণ। এক বোবা পুরুষের চোখ পড়েছে আরেক বোবার বউয়ের প্রতি।

কিন্তু... যখন সবাই ঘুমাচ্ছে, সেই বোবা পরপুরুষের সাথে নিজের বউকে হাতেনাতে ধরে ফেলেছে বোবা স্বামী... ব্যাপারটা বুঝতে বুঝতে একটা ব্যাপারে রাখালের দারুণ কৌতূহল তাকে অবাক করতে থাকে... ওদের গোঙানি, চিৎকারে যা সে অনুভব করে, পরপুরুষের শয্যাশায়িনী স্ত্রীর পক্ষে লড়ে যাচ্ছে তার স্বামী, আর সেই স্বামীর পক্ষে তার স্ত্রী।

এই স্তব্ধ রাতে এই বোবাদের এইরকম ঝগড়া-তর্ক এমন অদ্ভুত এক অনুভব দেয়, একদম যুক্তি ছাড়া... ভালোই হয়েছে, সে জন্মান্ধ... সভ্য মানুষেরা কি জীবনকে এইভাবে যুক্তিহীন অনুভবে ভাবতে পারে ?

কিন্তু এটাই শেষ না। যখন মতলববাজ ওদের ঝগড়া থামাতে অসহায় বিরক্ত হয়ে ঠেলার ওপর উঠে বসেছে...

নিদ্রায় এলায়িত রাখাল টের পায়... এতক্ষণ ঝগড়ায় লিপ্ত হয়ে স্তব্ধরাত ছাড়খার করা ওরা— একসাথে কী ভাষায় মীমাংসায় এসে হাঃ হাঃ হাসিতে মেতে উঠেছে।

হা! কী রহস্যময় এই দুনিয়া।

দিন যায় রাত যায়, সত্যিই এবার রাখালকে পুঁজি করে পয়সা আসতে শুরু করে মতলবের, সে রাখালের ভরণপোষণের দায়িত্ব নিয়ে যা উপার্জন করে নিজের থলেতে জমাতে থাকে।

একদিন রাখাল হাসে, মানুষ অলৌকিক ক্ষমতা দর্শন করে অনেক পয়সা দেয়, তুমি তো মতলব আমারে একটা পয়সাও দেও না।

এই— এই জন্যেই আল্লা তোরে আন্ধা বানাইছে। কোনো কৃতজ্ঞতা নাই। ওই বেটা ওই, সারাদিন কামাই কইরা কী করতি ? দুইডা ভাত ফুটাইয়া আলু ভর্তা দিয়া খাইয়া বটতলায় পইড়া থাকতি—

তখন রাখালের ব্যক্তিত্ব উত্তেজিত হয়, ঠিক আছে মানলাম, কিন্তু আমার উপার্জনের টাকা আমি পাইমো না ?

মতলবের জেদ কর্কশ কণ্ঠ আরো উজাতে থাকে, আমি না থাকলে তোর প্রতিভা কোন ব্যাডায় জানত ? কোনোদিন একটা লুঙ্গি কিনা পরছোস ? এই ডাট ফাট, ঘরবাড়ি, খানাপিনা— হু; ভালো মানুষ পাইছ তো আমারে—

গজগজ করতে করতে মতলব চলে যায়। ঝিম মেরে বসে থাকে রাখাল। এরই মাঝে ধীর পায়ে কল্পনার সেই ফাঁকে জোসনা এসে দাঁড়ায় ওর সামনে।

জোসনা... কেন তুমি এরকম অশরীরীর মতো আমার জীবনে আইসা এক পশলা বাতাসে বুক জুড়িয়ে আবার হারায়া যাও ?

কী জানি কেন ? কিন্তু বাহ! তোমার জীবন দেখি দিব্যি বদলায়া গেছে।

তুমি বলবা এই ঘর, লেপ তোশক, বসবার জায়গা, ফ্যানের শীতল বাতাস, যা কোনোদিন আমার কল্পনার মাঝেও আছিল না তাতেই আমার জীবন বদলায়া গেছে ?

কেন বদলায় নাই ? তুমারে তো চিনাই যাইতাছে না।

অস্ফুট হেসে রাখাল বলে, আমারে লোভী ধান্দাবাজ এইসব কইবা তো ? শোনো জোসনা, টাকা জিনিসটাই বড় খচ্চর। মনে লোভের আগুন জ্বালায়, মতলব এইসবের উপলক্ষ মাত্র।

আমি এ বনের পাখি আটকা পইড়া গেছি গো এই দুনিয়া খপ্পড়ের সোনার খাঁচায়— খাঁচার ভেতর অচিন পাখি কেমনে আসে যায়, নিজের অনিচ্ছায় আইলেও যাইবার পথটা দেখাইবা জোসনা ? আমার যে দমবন্ধ হয়া আইতাছে।

তুমিই তোমার পথ পাইবা রাখাল— কত বিচিত্র ক্ষমতা তোমার, এই রঙহারা দুনিয়ায় তুমি কত রঙ দেখো। খাঁচার সাধ্যি নাই, বেশিদিন তুমারে আটকায়।

জোসনা, যেও না। না...। তুমি তুমার জীবনটা আমারে বইলা যাও। কী এমন কষ্টের টানে তুমি বারবার আমার মতো পথ ভিখিরির স্বপ্নে আসো?

জোসনা অপসৃয়মাণ হতে হতে বলে... কিছু দুর্দান্ত কষ্ট থাকে যা বইলা হালকা হওয়া উচিত না... এরপর জোসনা মিলিয়ে গেলে রাখালের চোখে অমাবস্যা নামে। হাসতে হাসতে মিলিয়ে যায় জোসনা। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে বসে থাকে রাখাল।

বটগাছের নিচে রাখাল নিজের এই বিবর্তিত জীবনকে যখন ভেতরে ভেতরে কুঁকড়ে যন্ত্রণায় অভিসম্পাত করছে... তখন মাইক দিয়ে বক্তৃতা দিয়ে যাচ্ছে মতলব। রাখালের তা কানে যায় না।

ওখানে কী হচ্ছে ভাই ? একদিন একজন মানবিক মানুষ সাংঘাতিক দরদি কণ্ঠে প্রশ্ন করেন, প্রতিদিন দেখি জমে উঠেছে মানুষজন ওই মানুষটিকে ঘিরে!

একজন দর্শক বলে, কারে আপনি মানুষ বলতেছেন! উনি তো মানুষ না! মানুষের চাইতে একটু উপরে তার অবস্থান। চোখ নাই কিন্তু দিব্য চোখে সব দেখেন তিনি!

কী দেখেন ? আপনারা জানেন ?

আরে বললাম না সব দেখেন! কিন্তু সব কিছু বলেন না। খালি রঙের কথা বলেন।

রঙের কথা বলেন ? মানে ?

রঙ-বেরঙের দুনিয়ায় কত রঙের খেলা চলে, আমরা নানা গোরাম শহরের নাদান হাদারাম গাধা, তার কতটুকু দেখতে পাই—বুঝতে পাই ? ওনি সব দেখেন।

সব দেখেন!! সব বুঝেন, আপনারা তাকে নিয়ে কেন এমন খেলায় মেতেছেন ? এতই যদি সম্মান করেন তাকে, কেন তার দুঃখ আপনারা দেখেন না ? কেন তাকে মানুষ না ভেবে চিড়িয়াখানার পশু বানিয়ে তাকে নিয়ে খেলায় মেতেছেন ?

একজন মানবিক দর্শক বলেন, কে ? কে আপনি ?

আমি কে জানার দরকার নেই। লোকটার অবস্থা দেখছেন ? আপনাদের হট্টগোলের মধ্যে অসহায় পশুর মতো কেমন ভয় পেতে পেতে কাঁপছেন ?

আরে ? আপনি ক্যাডা ? লেখক না সাংবাদিক ? রাখাল কান পাতে।

সেই ঝকঝকে কণ্ঠের মানুষটি বলে— আমি ওর কেউ না।

তাহলে পলিটেশিয়ান ?

তক্ষুনি তাকে টানতে থাকে আরেকটি কণ্ঠ— তুমি চলো তো। কেন যে হুজ্জোতে নিজেকে জড়াও। এইসব এই দেশে নতুন নাকি ?

ঝকঝকে কণ্ঠের প্রতিবাদী লোকটি বলতে থাকে, হেঃ পলিটিশিয়ান। আই হেইট 'পলিটিক্স'। পলিটিক্স ইজ এ লিগেল মাফিয়া।

লোকটির বিলীয়মান কণ্ঠকে স্তব্ধ করে ফের মুখর হয় জনতা। ফটর ফটর ইংরেজিতে কি কৈয়ন গেলো ? হালা পাগল নাকি ?

উচ্চকিত হয় মতলবের কণ্ঠ— তা ভাই যা কইতেছিলাম...।

এক সময় বটগাছের নিচে রঙের খেলা থেমে যায়— অসহায় রাখাল নিশ্চুপ বসে আছে। তার সামনে থরে বিথরে টাকা। একেকজন একেকভাবে বসে আছে। এগিয়ে আসে মতলব, দু'জন ফিটফাট লোক সাথে নিয়ে।

ওই শুনছোস, ভিনদেশী এক প্রেসিডেন্ট আসতেছে। সেই প্রেসিডেন্ট আবার অন্ধ, বধির বিকলাঙ্গদের বিষয়ে দয়াবান। তিনি রাষ্ট্রকার্যের পাশাপাশি এইসব প্রতিবন্ধীদের আশ্রম পরিদর্শন করবেন।

তাই নাকি ? জনতার মধ্যে হুলস্থুল লেগে যায়।

রাখালকে বলে, আপনি যদি টাসকা লাগাইতে পারেন, তয়লে কিন্তু রাজা। এই যে ওনারা সব ব্যবস্থা কইরা দিব। কন দেখি ওনার টাইয়ের কী রং থাকব ?

কিছুক্ষণ স্তব্ধতা। ফিটফাট লোক দুটি নিশ্চুপ, কৌতূহলী। মতলব অধৈর্য হয় দুইজনই আপনার সামনে... এই ভাইয়েরা ভিড় সরান, কন ভাই কার টাইয়ের কী রঙ ?

রাখাল ঘোর কণ্ঠে বলে, উনারা সামনে না আসলে কেমনে কইমু ?

তক্ষুনি প্রেসিডেন্টের সেক্রেটারি এলে সব ভিড় সরে যায়, ঝকঝকে লোক দুটি সহ সে এসে বলে, ইংলিসে, বাংলা রূপান্তর করে আরেকজন, হ্যাঁ, রাখাল এই দেশে এসে তোমার কথা অনেক শুনেছি, আমি জাস্ট তোমাকে টেস্ট করতে এলাম, আগে আমার প্রশ্নের একটা উত্তর দাও, তুমি কি জন্মান্ধ নাকি ?

রাখাল নিরুত্তর। তিনি প্রশ্ন করেন, ঠিক আছে তুমি বলতে পারবে আমার শার্টের রঙ কী ?

গভীর দু'চোখ পেতে রাখাল উর্ধ্বমুখী তাকায়— খয়েরি।

সবাই আনন্দে চিৎকার করলেও প্রতিনিধি নিজেকে ঝালাই করতে ফের প্রশ্ন করেন।

কিন্তু তোমার ওই টসটসে চোখ দেখে যদি উনি তোমাকে বিশ্বাস না করেন ?

অসহায় বিপন্ন রাখাল ভেতর ক্রোধে আবারও নিশ্চুপ থাকে।

আচ্ছা। তুমি কি সত্যি চোখে দেখো না ?

অসহায় ক্রোধে রাখাল বুলি আউড়ে যায়— না দেখি না।

কিছুক্ষণ ভেবে সেক্রেটারি বলে, দেখো রাখাল, প্রেসিডেন্ট খুব কম সময়ের জন্য আসবেন। তোমাকে দেখা ছাড়াও তার আরও প্রচুর অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে। তোমার চোখ ভালো কী নষ্ট তা দেখার এক মিনিট সময় তিনি পাবেন না, সেক্ষেত্রে

একটু থেমে তিনি বলেন, তুমি যদি দেখতেই না পাও, তোমার ওই চোখের উপস্থিতি থাকলে কী আর না থাকলেই কী ? সত্যি কি না ?

মতলব মুহূর্তে লাফিয়ে উঠে মুহূর্তে ফটাস কণ্ঠে বলে, ওর চোখ দুটো আগেই আমরা উপড়ায়া রাখবো। তারপর উপস্থাপন করব মাননীয় অতিথির সামনে—

তাহলে তো সব দুশ্চিন্তা গেল।

না— না অনন্ত আঁধার ফুঁড়ে চিৎকার ধ্বনি-প্রতিধ্বনি ওঠে রাখালের— যার শব্দ কেউ শোনে না।

তারপর ?

তারপর ফুড়ুৎ।

তারপর ?

তারপরও ফুড়ুৎ...।

ধেৎ! জোসনা দাঁড়ায়। চান্স পেলেই আপনি আমাকে চড়ুই পাখির গল্প ফেঁদে বসেন। আমাকে খুকি পেয়েছেন ?

শোনো, পরিমল হাসে, এইবার সিরিয়াস হচ্ছি.. ছায়া আলোয় পরিমলের দীর্ঘদেহ প্রলম্বিত হয়। পুরো ক্রিসেন্ট লেক জুড়ে নেমে এসেছে আকাশ। এই কিছুক্ষণ আগেও নিভে যাওয়া বিকেলটি যখন সন্ধ্যার পর ধরে রাত্রির দিকে নামছি নামছি করছে, ভীষণ উদাস উদাস কণ্ঠে আকাশে দু'হাত তুলে পরিমল, দেখো দেখো ধবল সন্ধ্যার রঙ! ঠিক যেন ভোর হচ্ছে। রঙ ? পরিমলও রঙের কথা বলছে ? জোসনার নিজের মধ্যে নিমগ্ন চোখে ভর করেছিল বিহ্বলতা— পৃথিবীর কী আজব প্রান্তে আমরা থাকি, সেখানে সন্ধ্যায় ভোর আলোর পর যতই সময় গড়ায়, ততই অন্ধকার হয়।

এরপরই পরিমল যখন আসার পথে তার গাড়িতে চাপা পড়া এক বৃদ্ধের কথা বলছিল, তখনই জোসনার হিম চামড়ায় ভয়ার্ত কষ্টকর অনুভূতির কম্পন দেখে পরিমলও প্রথমে ঘাবড়ে যায়, ফের নিজ থেকে বেরোতেই যেন জোসনাকে বলে, কাল কী হবে, কে জানে ? চলো জোসনা আজকের দিনটাকে নিয়ে ভাবি ? আজ তোমার জীবনটা একটু শুনতে চাই ?

কিন্তু ক্রমশ বিপন্নতা ছেড়ে ক্রুদ্ধ হয়ে উঠতে থাকে জোসনা, তারপর কী হলো বুড়োটার ?

কোন বুড়োটার ?

গাড়ির নিচে চাপা পড়ে মরে যাওয়া বাবা-মা'র কথা মনে পড়তেই ফের কম্পিত জোসনা বলে, ওই যে আপনার গাড়িতে চাপা পড়া।

ও ভাগ্যিস তেমন চোট লাগে নি। তবুও তাকে পাশের ক্লিনিকে দিয়ে সব ব্যবস্থা করেই তো এলাম।

তারপর ?

এরপর জোসনাকে আরো হিম অতলে ফেলে নিজ স্বভাবের সহজতায় মেতে ওঠে পরিমলও শুরু করে চড়ুইয়ের গল্প, তারপর আর কী ? ফুড়ুৎ।

এমন সিরিয়াস বিষয় নিয়ে কিন্তু আপনি ফাজলামো করে যাচ্ছেন আশ্চর্য!

কী লাভ সিরিয়াস হয়ে ? তুমি যেন কত গুরুত্ব দাও আমার সিরিয়াস কথার সিরিয়াস আবেগের ?

কম্পিত ঠোঁটে বেদনার দাঁত চাপে জোসনা, বলে আপনিও জানেন, আমিও— একজন, একটি ব্রাহ্মণ কন্যার সাথে আপনার বিয়ের কথা চলছে—

বিয়ের কথা হচ্ছে মানেই তো বিয়ে হয়ে যাচ্ছে না ?

এইবার সত্যি সত্যি দৃঢ় হয় জোসনা, তীব্র চোখে তাকায় পরিমলের দিকে, ঠিক আছে। এখন একটা কথা একদম সিরিয়াসলি বলবেন, পরিবার ধর্ম বাদ দিয়ে, জাস্ট এক সপ্তাহ সময় দিলাম, আপনি আমাকে বিয়ে করবেন ?

রীতিমতো থতমতো বিব্রত বোধ করে ধীরে ধীরে পরিমল নিজেকে সামলায়, আরে ঠিকমতো দুজন চললামই না, বুঝলামই না... প্রেম করার সুযোগই হলো না।

ঝিম মেরে যায় জোসনা।

কী কথা বলছো না সে ?

হাঃ হাঃ হেসে তখন জোসনা বলে, চড়ুই পাখি বারোটা, ডিম পেরেছে তেরোটা, একটা ডিম নষ্ট, চড়ুই পাখির কষ্ট।

আরে এখন দেখছি ফান তুমি করছো। 'বিয়ে প্রস্তাবে' মুহূর্তে রীতিমতো লাই পেয়ে জোসনার দেহ ঘনিষ্ঠ হয়ে তার হাত ধরে আরেকটু ধাবিত হতে চায় পরিমল, আশ্চর্য মেয়ে তুমি, এতদিন পাত্তাই দাও না, এখন একবারে সরাসরি বিয়ে ? যা হোক তুমি নিশ্চয়ই আমার কথা বুঝতে পারছো আমরা আরও গভীরভাবে মিশি। প্রেমের জীবনের মজা নেই, বিয়ে হলে তো সব ডাল ভাত— পরে যদি ইচ্ছে হয়—

কুকুর ঘৃণিত আপনি, ভেতর ক্রোধে সে পরিমলের শরীর-কাছ থেকে ছিটকে দাঁড়ায় সে। এরপর লেক থেকে বেরিয়ে ছুটতে ছুটতে সে নিজ ঘরের দরজা বন্ধ করে হাঁপাতে থাকে। মেঝের মধ্যে তার আমূল অস্তিত্ব ভূপাতিত হয়। যেন একটি জান্তব গাড়ি তাকে হত্যা করতে হিংস্র ভঙ্গিতে ধেয়ে আসছে।

চোখ বন্ধ করে জোসনা নিশ্চুপ ছাদের দিকে তাকিয়ে থেকে— মা-বাবা রাখালের চোখের অন্ধকারকে অনুধাবন করতে চায়। এইভাবে কত সময় পার হয়েছে সহসা ঠাহর করতে পারে না।

কোথায় ডুবে যাও বার বার ? প্রশ্ন করে পরিমল— উত্তর দিচ্ছো না যে ?

রাখাল... ও রাখাল তোমাকেও সবাই মেরে ফেলতে শুরু করেছে ? আমারে একটু বাঁশি শুনাইবা ?

এরপর জোসনার জাগতিক ঘোর পৃথিবী থেকে ক্রমশ পরিমল উধাও, উধাও লালনের গান, কান পেতে অতলে তলাতে তলাতে জোসনা শোনে রাখালের বাঁশির সুর...'সময় গেলে সাধন হবে না'... যেন বা স্বপ্নের ঘোরে এলিয়ে পড়ে জোসনা।

ক্রমশ মতলব মিয়ার পোষা টিয়াতে পরিণত হতে থাকা রাখাল ভেতরে গুমড়ে গুমড়ে কাঁদে। কখনো তার মনে হয়, মতলব যখন ঘুমিয়ে থাকবে তখন সে অতি সন্তর্পণে ভাগা দেবে। কিন্তু মতলব চলে পাতায় পাতায়। সে কি রাখালের এই ফন্দি বুঝবে না ? চব্বিশ ঘণ্টা সে রাখালকে পাহারা দিয়ে রাখে। রাত্রেও ঘরে তালা দিয়ে চাবি রাখে গোপন পকেটে। সারাদিন আঁটোসাঁটো প্যান্টের মধ্যে নিজেকে ঢুকিয়ে এমন যন্ত্রণা হয় রাখালের, মনে হয় তার কোমর অব্দি কেউ বন্ধ বাক্সে ঢুকিয়ে রেখেছে। সে ডানে ঘোরে বাঁয়ে ঘোরে, ঠ্যাং টানে, স্বস্তি হয় না।

এইসব কার্যকলাপের মধ্যেও মাথায় ছায়াচক্র ঘোরে, প্রায়ই আজকাল গভীর যন্ত্রণায় সে বলে, চাইরদিক কী কালা গো!

দুনিয়াডারে শাদা দেখতে শিখো, খেঁকিয়ে ওঠে মতলব যখন, তখন ভাবে রাখাল, এই অবস্থায় কী করে দুনিয়া শাদা হয় ? বরং ঘোর কালো। তাইতো সে এতকাল দেখে এসেছে। বরং শৈশবে অনেক রঙ ছিল, হুহু তেপান্তরের সবুজ গ্রাম, দুখু বাউল বলত, দেখো দেখো রাখাল নদীর জল কী স্রোতস্বী, তারও রূপ কী ময়ূরাক্ষী। গ্রীষ্মে ঝিকিমিকি, শীতে কালো বিষণ্ণ, সূয্যিডুবি যেতে থাকলে সামনে লালচে লাল ছোপ। এরপর রাখালকে পাশে বসিয়ে দুখু বাউল যখন রাখাল বাঁশি বাজাচ্ছে একটানা, রাখাল তার পাশে বসে কতদিন ছুঁয়ে ছুঁয়ে নদীর রঙ পাল্টে দিয়েছে। সেই ছোপ ভেঙে গুঁড়িয়ে বাদামি এক রঙ ধারণ করত।

তখন দিন কী সুন্দর ছিল!

পৃথিবী ছিল বহুবর্ণ। সেই পিচ্চি বেলায় বাবা কাঁধে বসিয়ে অষ্টমীর মেলায় নিয়ে যেত। কত যে খেলনার ঝনঝনানি, তখন তো চেতনার মঞ্চে সেই পুরনো অভ্যাসেরই ছিন্নভিন্ন খেলা।

পুরনো কুরশি কাটারই নানা রঙের সুতোয় বোনা নকশা।

সেই কবে মা'র ওমে শুয়ে সে বলত, তোমার পরশ কী সবুজ গো!

কী যে বেহুদা বলিস তুই— ওকে জড়িয়ে মা গুনগুন গান গাইতে গাইতে ঘুমিয়ে পড়ত।

এরপর বাবার মৃত্যু।

মা'র অনন্তলোকে হারিয়ে যাওয়ার বিলীয়মান পদশব্দ। তারপরের স্মৃতি কেবল ছায়া আর অস্পষ্ট সোনালির ঢেউ দিয়ে বোনা। কিন্তু সেই বয়সেই কখনো ছুঁয়ে কখনো সর্বান্তকরণে যে-কোনো কিছুকে স্পর্শ করে তার রঙ বলার অভ্যাসটা তার চিরকালীন হয়ে যায়।

রাখালকে তালা দিয়ে মতলব মিয়া বাজারে গেলে উদাস দুপুরের বিছানায় নিঃস্ব হয়ে পড়ে থাকে রাখাল। আহারে জোসনা শাদা হলেও তার পৃথিবীটাও না জানি কত কালো। হিন্দু-মুসলিম-এর ভেদ ভেঙে নার্স জোসনা কি ডাক্তার পরিমলের জীবনের সাথে নিজের জীবনকে এক করতে পারবে ? মনের মধ্যে কত হাহাকার থাকলে একাকী জোসনা রাতভর লালন শোনে ?

জানালায় ধ্বনি... রাখাল... ও রাখাল ?

এরকম নারী কণ্ঠে চমকে রাখাল বিছানায় বসে,

কে ? কে ?

আমি গো আমি।

ঘোরে পড়া রাখালের পরান তরঙ্গিত হয়, অস্ফুট কণ্ঠে বলে আমি, কে ?

তোমার হাত দু'খানি জানালা দিয়া বাড়াইবা ?

অকুল জলে খড়কুটো পাওয়ার মতো হেঁটে হেঁটে রাখাল জানালায় কী আকুল দু'হাত বাড়ায়— কে ?

আমি তুমার মাঝরাত্তিরের জোসনা গো!

মুহূর্তে হিম হয়ে আসে রাখালের শরীর। তীব্র তাচ্ছিল্যে দু'হাত সরিয়ে ঝাঁঝালো কণ্ঠে বলে, তুমি মতলববাজের শেফালী। তুমি আমার জোসনার নাম জানো কেমনে ?

কিছুক্ষণ চুপ থেকে শেফালী বলে, তুমার মুখেই যে দিন রাইত তার নাম বন্দনা শুনছি গো...। আহারে শরীরটারে বেচতে বেচতে মাইরাই ফালাইতেছিলাম, তোমার মরদ শরীলে এত মায়া। ভুলবার পারি না। পাঠশালোর মতো ট্যাং-ট্যাইঙ্গা মতলবের শরীলকে এখন ঘিন্না লাগে। জানো হারামি তুমারে ভাগাইবার লাইগ্যা তুমার শইল্যে সাপ ছাইড়া নিজেই চিক্কোর পরে দিছে।

আমি জানি, এহন তুমি যাও... ভেতর যন্ত্রণায় কাঁপতে থাকে রাখাল। শেফালি বলে, তুমারে চিড়িয়াখানার জন্তু বানায়া কী ব্যবসাটাই না করতাছে! রাখাল তুমি জোসনা ভাইবা আমারে তুমার শইল্যে জায়গা দিবা ?

ওই ছেনাল মুখে আমার জোসনার নাম নিবি না, দাঁতে দাঁত চিপে রাখাল বলে, তুই শরীল ছাড়া আর কিছু বুঝস না ? দেহ বাইচ্চা খাস... বেশ্যা!

মুহূর্তে যে ভূমণ্ডলে বজ্রপাতের কাঁপন ঘটে, ক্রুদ্ধ রাগে ফেটে পড়ে শেফালী, আহারে দেমাগ দেখলে বাঁচি না। আমি তো শরীল বেইচ্যা খাই, তর মতো মাইনসের কাছে তো হাত পাতি না... শালার ফকিন্নি... আজাইরাই মায়া করবার আইছিলাম... থু...।

বলে গনগনে পায়ে জানালা থেকে দূরে চলে যায় শেফালী।

বিছানায় ফিরে রাখাল কিছুক্ষণ বজ্রাহতের মতো বসে থাকে।

জীবনের ওপর দিয়ে অনেক ঝড় ধকল গেছে। কিন্তু মেরুদণ্ডে এতবড় হাতুড়ির ঘা এই বাক্য শোনার আগে এর আগে আর পড়ে নি। নিজেকে অন্ধ ভেবে মানুষের কাছে করুণাকাতুর বানিয়ে যেভাবে সে দিনের পর দিন নির্লজ্জ করে হাত পেতে গেছে, যাদের সামনে পেতেছে, তারা যেন প্রচণ্ড হট্টগোলে তার চারপাশ ঘিরে ব্যঙ্গ করে হাসতে থাকে। জোসনাও বলেছিল, আর ভিক্ষা করো না। তখন কেন সে এই কথাটাকে গুরুত্ব দেয় নি ? অবশ্য জোসনা ঘোরে পড়ে থাকা রাখালকে যে মমতা আর সম্মান নিয়ে সে কথাটা বলেছিল, তাতে সে এত প্রকটভাবে অসম্মানের জায়গাটা অনুভব করে নি... একেবারে মেরুদণ্ডে নখর আঙুল বিদ্ধ করে।

শেফালী যেটা তাকে মুহূর্তেই এক মস্ত হাতুড়ির বাড়ি দিয়ে রাখালকে তুমুল ভূপিতত করে বুঝিয়ে গেল, এর আগে জীবনে এভাবে রাখাল বুঝে নি। আহা! জোসনাও তাকে এতদিন ধরে কী করুণাটাই না করে গেছে... হাপুস ক্রন্দনে ডুবতে ডুবতে রাখাল দেখতে পায়, খুলে যাচ্ছে অলৌকিক দরজা, সে যদি মানুষকে বাঁশি শুনিয়ে টাকা নিত, তাহলেও তো সেটা ভিক্ষা করা হতো না। আর তার রঙ দেখার ক্ষমতা নিয়ে যেভাবে দেদারসে টাকা কামাচ্ছে মতলব, রাখাল গোড়ায় যদি এই ক্ষমতা প্রদর্শন করে টাকা কামাত, তাহলে কি তার আজ দুর্দশা এই হতো ?

নাহ! বড্ড দেরি হয়ে গেছে। আর এখন ? মতলববাজ তো না, বোদাই রাখাল এক মহা অজগরের খপ্পড়ে পড়ে গেছে। রাখালকে 'নিজের আবিষ্কার' হিসেবে প্রমাণ করে দেখিয়েছে মানুষকে মতলববাজ, সে কতটা তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন আর ক্ষমতাবান।

এখন হাত-পা ছেড়ে জলের ওপর ভেসে থাকা ছাড়া রাখালের আর কিছু করার উপায় নেই।

জীবনের পরতে পরতে কত অভিজ্ঞতা মতলববাজের। ছিন্নভিন্ন স্মৃতির সাথে একই স্মৃতির পুনরাবৃত্তির রোমন্থন। স্ত্রী-সন্তানকে গ্রামে ফেলে ভেগে আসার আগে সে যখন চেয়ারম্যানের সাথে কাজ করত, ভোটের আগে কে কত চমক দিতে পারে, কে কত কারিশমা দেখাতে পারে, এরই তোড়জোর শুরু হতো। সে একবার প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার জন্য জনসম্মুখে এক নারীকে দাঁড় করিয়েছে, ধর্ষিতা হিসেবে, বলেছে প্রতিপক্ষ পার্টি তার বোনের এই সর্বনাশ করেছে। আরো কত ঘটনা। বেশির ভাগ মানুষ এইসব বিষয়গুলো তাড়াতাড়ি খায়। মতলবের কেন বারবার এইসব মনে পড়ে? যা হোক, এইসব বিষয় নিয়ে নানা রকম মুখরোচক আলোচনায় পরিস্থিতি গরম করে তোলে। এত যে মূল্যবান প্রাণ, তেলাপোকা দেখলে ধড়ফড় করে ওঠে, সব মিথ্যা। সব ভাওতাবাজি— এসব বুঝেও নেতার জন্য সেই আপন প্রাণই তুলে দেয় কেউ বন্দুকের সামনে। এদের প্রবণতার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক, এঁরা নিপুণ কায়দায় গল্প বানাতে পারে। বিষয়টা অনেকটা এমন, উঁইপোকা কেটেছে একটি কাপড়ের সুচের মতো অংশ... দেখি দেখি? বলে আঙুল ঢুকিয়ে কিছুক্ষণের মধ্যেই দেখা গেল সেটি ব্যাপক হয়ে উঠেছে কিন্তু গল্পটিকে প্রলম্বিত করার জন্য প্রথমে সুচের মতো ছিদ্রটা তো থাকা চাই। নইলে তো মানুষের জুত হয় না। মতলববাজ ইলেকশনের সময় এরকম কত 'কথাসাহিত্যিক' যে দেখেছে। কী নিখুঁত তাদের গল্প বানানোর ভঙ্গি, কী নিখুঁত বর্ণনা—

একজন তো রীতিমতো হুলস্থূল ফেলে দিয়েছিল।

এক ভিখিরিকে এক টাকা দান করেছিল চেয়ারম্যান, ... চামচাদের মাধ্যমে খবর পরম্পরায় বিষয়টা একসময় একশ' টাকা থেকে এক হাজার টাকায় পরিণত হয়... এটাও তবুও সহ্যের মধ্যে ছিল,

কোরআন ছুঁয়ে নিজ চোক্ষে ব্যাপারটা দেখেছে, চেয়ারম্যানের এক বয়স্ক খাস চামচা যখন বলে বসে, বৃদ্ধ ল্যাংড়ার করুণ অবস্থা দেখে তাকে বাড়ি নাকি বানানোর জন্য লাখ টাকা দিয়েছে বলে প্রচার করে এবং বলে, চেয়ারম্যান ইসলামের এই নীতিতে বিশ্বাস করেন, ডান হাতে দান করলে বাম হাত যেন তা দেখতে না পায়, এই দান এর ব্যাপারটা দেখে ফেলায় চেয়ারম্যানের এই বদান্যতার ব্যাপারটা কিছুতেই সেই বয়স্ক চামচা পাবলিককে না জানিয়ে শান্তি পাচ্ছে না, বলে সে এখন এটা প্রকাশ করেছে— পাবলিকের সন্দেহ হলে এলো কোরআন ছোঁয়ার পালা। যা

হোক, তারপরই সেই চেয়ারম্যানের বাড়ির সামনে হাজার হাজার বিকলাঙ্গ ল্যাংড়া মানুষের ভিড় জমে যেতে শুরু করে, তখনই বিষয়টা মারাত্মক আকারে পরিণত হয়।

রীতিমতো পুকুরচুরি মিথ্যাচার!

এই অন্ধ রাখালের ক্ষেত্রে প্রচারও কিছুটা কম মাত্রায় শুরু হয়েছিল। সে যখন একের পর এক স্পর্শে, ঘ্রাণে রঙ বলতে শুরু করে, এমনকি কাগজে ছাপানো বে-নি-আ-স-হ-ক-লা তর্জনীর ডগা ছুঁয়ে ছুঁয়ে বলে দেয় তার কী কী রঙ— মানুষজন রীতিমতো তাজ্জব হয়ে যেতো। কিন্তু এখন তো মতলবের মাধ্যমে রাখালের সেই সুঁচ ফুটো ক্ষমতা তেমনই ব্যাপক আকার ধারণ করছে।

নিজের ঘরে নিদ্রাহীন রাতে তলায়মান স্বপ্নের অতলে ডুবতে থাকে রাখাল।

ভাবে, আমি কি লোভের সাগরে ডুবে সাঁতার খেলছি। না সুখের সমুদ্রে ভাসছি? বুঝতে পারছি না কেন?

যেন দু'ডানা মেলে জোসনা এসে দাঁড়ায়, তুমি এত রঙ ধরো আর নিজের মনের রঙ ধরতে পারো না?

পারি না তো।

অথচ দুষ্ট লোকেরা ঠাট্টা মস্করা করে বলে তুমি রংবাজ। জায়গামতো ঘাইগুঁতো খেলে সব রঙ ছুটে যাবে।

ওরাই হয়তো ঠিক বলে। নিঃস্ব আমি। কিছু নেই আমার। তবু কিছু কিছু সুখ ছিল। সুখের খেলা ছিল আমার— যা সব ধীরে ধীরে মিলিয়ে যাচ্ছে অনন্তলোকে।

সুখের খেলা! বুঝলাম না। তোমার কী হয়েছে রাখাল?

কী জানি, আমি কি আর আমার আছি? এ রঙের খেলা রোগ হয়তো। বারবার এক যন্ত্রণাই বেশি গুঁতোয় যা ছিল আমার একার আনন্দ, একার সুখ। নিজের ভেতর ছিল গভীর কী যে মজা! মতলবের মতলববাজিতে জনে জনে বিলিয়ে দিয়ে আজ আমি নিজের কাছে একেবারে হেলাফেলা নিঃস্ব হয়া গেছি।

জোসনা তুমি চলে যাও... আমি এই সুখেই, বাকি জীবনটা কাটাই।

এইসব কী বলছ রাখাল? জীবনে এত যুদ্ধ রক্ত... আজ হাল ছাইড়া দিবা?

শাদা পোশাকের বড় মনের মানুষ তুমি, তুমিও হয়তো জানো না তোমাকে নিয়েও সুখের খেলা ছিল আমার মনের গভীরে। কত খেলা খেলেছি মনে মনে, কিন্তু থাক... শেফালী সব শেষ করে দিয়ে গেছে।

আশ্চর্য হয়ে জোসনা তাকিয়ে থাকে। আ-মা-কে নিয়ে তোমার সুখের খেলা!

প্রতিদিন সকালে রাত্তিরে ভাবনার পথে আর তোমার আসা যাওয়ার পথে শাদা পোশাকের শাদা মনের ভালো মনের মানুষটির জন্যে আমার থাকত আকুল ব্যাকুল প্রার্থনা। দেখা হইলেও— না হইলেও।

আমার জন্যে তোমার প্রার্থনা সে আবার কেমন খেলা?

হ্যাঁ। খেলাই। সব খেলাই কি হালকা হয়, সেটা তো আমার সুখের খেলা ছিল।

সেই খেলায় কী কল্পনা করতা আমারে নিয়া ? কী প্রার্থনা করতা আমার জন্য ?

কতশত রকমের কল্পনা, প্রার্থনা। সৃষ্টিকর্তা যদি আমার কথা একদিন শুনে থাকে, তাহলে কোনো কষ্টই তোমার 'শাদা'র মধ্যে এক ফোঁটা কালো লাগতে দিবে না।

আমি যে তোমার পাশ দিয়ে যেতাম, করতাম, উড়তাম তুমি বুঝতে কী করে ?

আমি আমার সুখ দিয়ে, মজা দিয়ে, আনন্দ দিয়ে ঠিক ঠিক বুঝতে পারতাম। মুহূর্তে মুহূর্তে অনুভব করতাম এই বুঝি ফিরে তাকাল শাদা পোশাকের পরীটি। আমি থেমে গেছি সম্মানে, শ্রদ্ধায়, ভালোবাসায়, প্রেমে।

সব বুঝলাম রাখাল, কিন্তু কেন যা হচ্ছে তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদে ফেটে পড়ছো না ?

কেন না বোঝার ভান করছো জোসনা ? তুমিই তো প্রথম আমার মনের প্রেমকে প্রথম স্পর্শ করলে ? আমি আর আমার নিয়ন্ত্রণে আছি ? যাও জোসনা... যাও... আমি বিকায়ে গেছি। ফুরায়ে গেছি... রাত্তির শেষ প্রহরে ক্লান্তিতে রাখাল ঘুমিয়ে পড়ে।

এদিকে রাখালের এ জাতীয় নিঃশব্দ তড়পানি যত দেখে, মতলব তত ক্ষেপে, কবে রাষ্ট্রপতি আইবো আমি মরতাছি প্রোগ্রামটা ক্যান্সেল হয়া গেল নাকি ? আমি মরি হেই চিন্তায়, আরে তুমি পইড়া রইছো আজাইরা দুঃখ বেদনা নিয়া, শালা। তুমি কী জানো দুনিয়া কত কঠিন। শুইয়া বইস্যা ভিক্ষা করছো। আর ভাত খায়া ঘুম দিছো। জীবনের ক্ষরণ পূরণে বউ বাচ্চারে ফালায়া ঢাকা আইসা নিজ পেট বাঁচাইতে ফেনসিডিল থাইক্যা কত ব্যবসা করলাম, বহুদিন পর দুইটা ভালা টাকার মুখ দুইজনে এক লগে দেখতাছি, ভাবতাছি— বউটারে শহরে আনমু... বাচ্চাগুলোর পড়াশোনা শিখাইমু... এইবার মতলব মিয়ার চোখ ক্রমশ ঘোর আচ্ছন্ন হতে থাকে। অন্ধকার বিছানায় শুয়ে রাখালও ভাবে, তাইতো খাঁটি কথাই তো বলেছে মতলব। ভালো ঘর, ভালো খাদ্য, আরাম, দামি লেপতোশকের কথা এই জীবনে স্বপ্নে ভেবেছে সে ? এই ঘরের আরাম যদি সে গ্রহণ করতে না পারে ? এই ছিন্নমূল জীবনে জোসনার মুখ স্পর্শ করার ভাবনা সে ভাবে কী করে ?

কিন্তু তারপরও শান্তি হয় না। আমার উপার্জনের টাকা আমি পাইমু না ?— এই কষ্ট ফের তার শান্তি হারাম করতে থাকলে সে অনুভব করে, আসলে টাকা জিনিসটাই বড় খচ্চর। যা হোক তরঙ্গের ফেনার মতো মতলববাজের চাপাবাজির তোড় সর্বত্র ছড়াতে থাকে। আর 'ফুটো' কে 'ব্যাপক' করার দক্ষতা তো অলস মাথার লোকদের থাকেই। একসময় তারা বলতে শুরু করে রঙ বলার ক্ষমতা রাখাল ভিখিরির হাজার ক্ষমতার একটি— সে ধীরে ধীরে তার আরো আরো ক্ষমতা প্রকাশ করবে। ছড়াতে ছড়াতে কথা এই পর্যন্ত যায়— ভিখিরি আসলে মানুষ নয়, সে এক অলৌকিক প্রাণী বিশেষ। মানুষের চেহারা কখনো এমুন আজিব কিসিমের মতো হয় যা অন্য কোনো মানুষের সাথে মেলে না ?

আজিব কিসিম ? রাখাল অধঃপাতে তলায়... জোসনা... ও জোসনা, তুমি এর মাঝেই কী করে মায়া দেখতে পেয়েছিলে ?

এভাবেই দিনরাতগুলি চলছিল। ক্রমে মানুষ রঙ বিষয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়লে মতলব মিয়ার দুশ্চিন্তা বাড়তে থাকে। সে প্রেসিডেন্টের আগমনের বিষয়ে খোঁজ লাগিয়ে রাখে, কিন্তু। 'আপাতত' প্রোগ্রাম স্থগিত— এটা শুনে জীবনে বাঁচার ওপর সাধ উঠে যাওয়ারই উপক্রম হয় তার। কিন্তু বসে থাকা তার স্বভাবে নেই। সে ক্রমশ রাখালের মধ্যে টিয়ে পাখির ফিকির করতে থাকে, বলে তুই হাত গুইনা মাইনসের ভাগ্য গুনবি। আমি তরে শিখাইমু কুন পেশার লোকেরে তুই কী কইবি।

রাখালের জুত লাগে না, বলে না ভাই, আমার পুরনো জীবনের রঙ নিয়া খেলার ভেতর একলা খেলা জীবনই ভালা। তুমি সত্যি আমারে নিঃস্ব কইরা দিছো। বহুত হইছে। আমাকে মুক্তি দেও। এহন এই রঙ নিয়া আসমান পাতালের অনন্ত রঙে মিইশ্যা যাইমু।

অলৌকিক এক স্তব্ধতায় স্থির বসে রাখাল দিগন্ত পথে চলতে চলতে একাকী বাঁশি বাজিয়ে চলায়িত রাখাল বলে কেউ না।

এইভাবে যখন নিস্তরঙ্গ দিনগুলো যাচ্ছিল, তখন মতলবকে একেবারে তুমুল আসমানের ডগায় উঠিয়ে সেই প্রতিনিধিসহ সদল বলে সেই প্রেসিডেন্ট আসছেন। মুহূর্তে এই দেশে বিশেষত প্রতিবন্ধীদের মধ্যে এই নিয়ে হুলস্থুল।

আর কে পায় মতলবাজকে, বলা যায় চিমশে পড়া-মড়া চিতা দিয়ে বীর শক্তিতে সে ফাল দিয়ে দাঁড়ায়। সে পুরনো যোগাযোগকে কাজে লাগিয়ে, চারদিকে 'ফেউ' লাগিয়ে জানতে পায়, ইতোমধ্যে তিনি এই রঙ ভিখিরির ক্ষমতা সম্পর্কে অবহিত হয়েছেন।

টনক নড়ে অনেকের। এই দেশের উঁচুদরের কর্মকর্তারা, যারা এতদিন বিষয়টিকে আমলের মধ্যেই আনে নি, তারা থেকে শুরু করে ফুটপাতে বাস করা মানুষদের মধ্যেও তুমুল গুঞ্জরণ ওঠে। রাখালকে এনে নানারকম পরীক্ষা চালায়। সবাই যখন তার আজব ক্ষমতায় তাজ্জব, তখন একজন বয়ান করে প্রতিনিধির সেই গুরুত্বপূর্ণ বাক্যের কথা। প্রেসিডেন্ট্র কাছে রাখালের জন্য এক মিনিট সময় বরাদ্দ থাকবে কি-না যেহেতু এটা একটা ভাবনার ব্যাপার, তো সেই ক্ষেত্রে রাখালের এই চক্ষু উৎপাটনের ব্যাপারটি তারা কী করে ভুলে ছিল?

সারা অবস্থার মধ্যে স্তব্ধতা নেমে আসে। কিছুক্ষণ কেউ কথা বলতে পারে না।

কিন্তু মতলব চিৎকার করে বলে, ওর চোখ দুটি উঠিয়ে দেয়া হোক— ওরা তখন ভুইলা ছিল, এখন উঠায়া দিলেই তো সমাধান। এতে ভুল হওয়ার কী আছে ?

হাসপাতালে ঘুমের মধ্যে রাখাল চেঁচিয়ে ওঠে— না! না...।

কিন্তু ততক্ষণে যা হওয়ার হয়ে গেছে। তন্দ্রার মধ্যে এগিয়ে আসে জোসনা, এ কেন করতে দিলা তুমি ? তুমি কি জানো না এই চক্ষু আমার ?

দুঃসময় আমাকে ঘিরে ধরছে চারদিক থাইকা। এত একা লাগছে, একা। কী নিদারুণ একা আমি! আমি কে ? কে আসলে আমি ? কোথায় ছিলাম আমি ? এখন কোথায় আমি ? কী দরকার আমার এই পৃথিবীতে ? বাবা, মা, মাগো, কই তুমরা ?

রাত যায় দিন যায়, নাগরিক আকাশ ছিঁড়ে পাখি চলে যায়। সবাই চলে যায়—

তন্দ্রায় মা এসে তার শিশু মাথা কোলে নেয়। রাখাল জিজ্ঞেস করে মাগো তুমি আইছো ? মা আমি কোথায় যাব ? হেই মা শুনছো— আমার আর একা ভালো লাগছে না।

আমার বুকে শুইয়া থাক। এত পাগল হইস না বা'জান।

আমি মনে হয় পাগলই হয়া যাব— তলায়া যাইমু... তলায়া...।

বাবা তুমি এইভাবে বলতেছো কেন ? এই যে আমি আইছি। শান্ত হও বা'জান

মা তুমি জানো না ? ওরা আমারে কী ওষুধ যে দেয়। কেবল ঘুম আর ঘুম। মরণ ঘুম আমারে তলাইয়া...।

চুপ কর, বাপ চুপ।

নেশালু আঁধারে বিড়বিড় করে রাখালের স্বর। না-না। আমি আমার দিন রাত সব হারায়া ফালাইছি।

অলৌকিক ছায়াদল চারপাশে নৃত্যরু অবস্থায় বলে, তুমি এত রঙ ধরতে পারো। আর বর্তমান পৃথিবীর রঙটা ধরতে পারতেছো না ?

পারছি না তো।

গাঁদা ফুলের বাগানে বড় বড় ফুলগুলো ফুটে আছে থরে বিথরে। রাখাল দেখেছো কখনো ?

হ্যাঁ হ্যাঁ ওইতে হলুদ-হলুদ হলুদের মাখামাখি য্যান, সেই হলুদ আমার সাথে দুষ্টুমি মার্কা অট্টহাসিতে ফেটে পড়ছে বারবার। সব সব হারাইয়া যাইতেছে। শুধু

জোনাকি পোকা জ্বলতাছে আমার মনের মধ্যে। ভালো কইরা আলো ধরবার গেলে, সব অন্ধকার হয়া যাইতেছে। দিনের ভালো রাইতের কালা সব এক হয়া যাইতেছে।

মা যেন এখন নিজেই অবুঝ শিশুর মতো রাখালের বুকের ওপর মাথা পেতে শুয়ে পড়ে— আমি বেবাক শুনতাছি তুমার বুকের ধরক ধরক এইসব শব্দ কোনো শব্দ নয়... অনন্ত বাঁশির সুর।

ঘোর কেটে গেলে, মা'র চিহ্নমান নেই চারপাশে, সবই তন্দ্রা ঘুমের বিভ্রম! ব্যান্ডেজে হাত রেখে ভেতরে ভেতরে গুমরে কাঁদে রাখাল— সে রঙ খোঁজে। কেবল অন্ধকার। তার মধ্যে পৈশাচিক রক্তের হুল্লোড়। পাপড়ির নিচটা বড্ড ফাঁকা হয়ে গেছে। সে আগেও অন্ধ ছিল। কিন্তু দুটো চোখের টলটলে উপস্থিতি তাকে এই বোধ দিত যে সে চোখ বুজে আছে মাত্র। জোসনা... ওরা আমার এ-কী সর্বনাশ করল আমার ? আমার বাঁচন স্বপ্নের শেষ আশ্রয় ছিলা তুমি। আমার আজীবন একলার জীবনেও এই পুঁতিহীন চক্ষু দিয়া স্বপনেও তো তোমার সামনে দাঁড়াইবার পারুম না। হে আল্লাহ! আমারে উঠাইয়া নেও। উঠায়া নেও।

সারা দেশে প্রেসিডেন্ট আসা নিয়ে হই হই রব। শহর সেজেছে উজ্জ্বল আলোয়। এদেশের দারিদ্র্যের বিশাল স্তূপ ঢেকে দিয়েছে চটের চাদর, পলিথিন। পুরনো দর্শকরাও নতুন উদ্যমে রাখালকে ঘাঁটাতে শুরু করে, এটা কী রঙ ?

রাখাল হাসপাতাল থেকে বেরোনোর পর থেকেই নিশ্চুপ।

আচ্ছা, ওটা বলো কী রঙ ?

রাখাল নিশ্চুপ। সে কেবল হাতমুঠো করে নিশ্চল বসে থাকে। যেখানে লাল রক্ত শুকিয়ে আছে। ঠেলতে ঠেলতে সেই মানুষগুলো কোনো মৃতের জগতে নিয়ে গিয়েছিল, কী ভীষণ কঠিন শীত। আর যন্ত্রণা যেন গনগনে লোহা, যা দোযখের শাস্তিতে লেখা থাকে। এরা মানুষ ? উত্তেজনা আর তাড়াহুড়ার হুজ্জোতে সরকারি হাসপাতালে কয়েকজন অতি গোপনে কর্মটি সম্পন্ন করতে গিয়ে তাকে অজ্ঞান করার বিষয়টি নিয়ে পর্যন্ত ভাবতে পারে নি ? কারণ এটা প্রকাশ্যে সবাইকে জানান দিয়ে করতে গেলে, নানারকম নিষেধ আর প্রতিবাদে কর্মটি হয়তো সম্পন্নই হতো না। রাখালের মাথায় কিছু কাজ করে না। শুধু দু'হাত চেপে মুঠি ভরে চেপে রাখে রক্ত গ্রহণ করার দৃশ্যটি। কেমন ছেঁড়া কালো মেঘের মতো। মতলব মিয়া ফিসফিস করে— এইবার আপনে রাজা হইবেন।

বা'জান গো, তুমিই তো আঙুল ধইরা ক্ষেত পানে লইয়া যাইতে যাইতে কইছিলা এই দুনিয়ার কালাও ভালা আন্ধার থাইক্যাই তো জন্ম লয় বাপ সুরুজের...

তুই তোর আন্ধার চোখ দিয়া মনের সুন্দর দিয়া দেখবি, দুনিয়া কত সুন্দর...। ও বা'জান তুমি মরণের কোন অতলে হারাইলা ? সেইখানের রঙ কী ?

নাহ্ শুধুই অন্ধকার। যেখানে জড় দুটো টসটসে চোখ ছিল সেখানে বিকট ক্ষীণ শীত আর যন্ত্রণার গনগনে লোহা দোজখের শান্তিতে খেলা করছে। পৈশাচিক উল্লাসে সেখানে শুধু রক্তের হুলোড়, দুমড়ে মুচড়ে ভেঙে চুরচুর হতে থাকে রাখাল।

চারপাশে সশব্দ কোরাস। বিভিন্ন সফরের মাঝে রুটিন মতো বিদেশী প্রেসিডেন্ট এসেছেন। এর মাঝেই প্রচণ্ড ভিড় ঠেলে মৃতপ্রায় রাখালের শরীরের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে কেউ— একী করলা তুমি রাখাল ? আমার বাবা-মা গেছে! তোমার চোখও ? আমি এখন কার চোখ দিয়া পৃথিবী দেখব ?

রাখালের মৃত রক্তের মাঝে ক্রমশ জীবিত রক্তের সঞ্চালন ঘটে... হাতড়ে হাতড়ে সে স্পর্শ করে একটি বাঁশি... জোসনা ?

না... না... জোসনা তো সেইদিন তার বুকের ওপর থেকে ওর ভয়ে চলে গিয়েছিল।

কিন্তু ফের ঘোর থেকে বেরিয়ে না, স্বপ্ন না, বাস্তবের জোসনাকে তার স্পর্শের মধ্যে পেয়ে অভিভূত হয়ে পড়ে। চলো আমরা এই নষ্ট জগৎ থাইকা অনেক দূরে চইলা যাই। জোসনার এই কথায়— ও আল্লা ? না... এ বিভ্রম নয়, হাজার ভিড়ে রক্ত মাংসের বাস্তব জোসনার হাত-মুখ কম্পিত হাতে স্পর্শ করতে করতে রাখালের ভূমণ্ডল কাঁপে... আমার সব শেষ হয়া গেছে জোসনা।

তুমি বাঁশি বাজাইবা, আমি তোমার সাথে গাইব লালন...।

এরপর স্তব্ধতা।

এদেশের রথি মহারথির সামনে প্রেসিডেন্ট। তার প্রতিনিধি মুহূর্তে সামনে এসে দাঁড়িয়েছে যেন রেডিওতে ইংরেজি সংবাদ পড়ছে এভাবেই বলে, স্যার গতবার আপনার প্রোটেকশনের ব্যাপারে খোঁজ নিতে এসে অনেক প্রতিবন্ধীর মধ্যে 'স্পেশালি' আমি এর কথাই বলেছিলাম। এই অন্ধের আশ্চর্য ক্ষমতা, যে ঘ্রাণে, স্পর্শে কিছু না দেখেই রঙ বলতে পারে।

চারপাশে হাজার টিভি ক্যামেরার ক্লিক ক্লিক। রাখালকে আঁকড়ে ধরা জোসনা এহেন অবস্থায় নিজেকে দুর্দান্ত বিপর্যস্ত বোধ করে।

স্ট্রেঞ্জ! প্রেসিডেন্ট অবাক কম্পিত হয়ে রাখালের কাছে গেলে জোসনা তার সমস্ত অস্তিত্ব দিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরে। এতে রাখাল নতুন জীবনের শক্তি পায়।

সেই ছাপার অক্ষরের মতো কণ্ঠ হুমড়ি খেয়ে পড়ে রাখালের ওপর, স্যার তার কোট ছুঁয়ে বলতে বলেছেন— ওটার রঙ কী ?

সমস্ত পরিবেশ স্তব্ধ হয়ে উঠেছে। চারদিকে হাজার মানুষের দমবন্ধ। নীল কোট পরা প্রেসিডেন্টের মুখে বিস্ময়। মুহূর্ত মাত্র... সে যেন তার চক্ষু কোটর থেকে টপটপ করে ঝরে পড়া রক্ত নিজ হাতের ওপর পড়ছে এই অনুভবে— সবাইকে গভীর হতাশার নিশ্বাসে তলিয়ে দিয়ে জোসনাকে উদ্ভাসিত হাসিতে ছড়িয়ে মুঠো হাত মেলে ধরে আলোয়, এরপর, দাঁতে দাঁত চেপে বলে, লাল!